বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী সমাজের ভূমিকা (১৯৭২-২০০০)

উপস্থাপনকারী

মোছাঃ দীল আফরোজা খানম
নিবন্ধন নং-০৪
শিক্ষাবর্ষ-১৯৯৯-২০০০
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

আবুল কাসেম ফজলুল হক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449600

Dhaka University Library
449600

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

449600

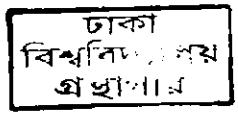

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোছাঃ দীল আফরোজা খানম এর 'বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী সমাজের ভূমিকা (১৯৭২-২০০০)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রী লাভ করার জন্য লিখিত ও উপস্থাপিত। আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভের কোন অধ্যায় বা অংশ-বিশেষ অন্য কোথাও কোনো ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত হয়নি বা প্রকাশিত হয়নি।

আবুল কাসেম ফজলুল হক
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে প্রথমে আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে তোলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। পরে তিনি এই গবেষণার বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রতিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহিষ্ণু তাগিদ দিয়ে আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত এই গবেষণা তাঁর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করতে পেরেছি, তাঁরই পরামর্শ ও অনুপ্রেরণায়। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

এই গবেষণা শুরু করার প্রথম পর্যায়ে মূল্যবান কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর আহমদ কবির। তিনি আমার প্রথম বর্ষের একটি কোর্সের শিক্ষক ছিলেন।

গবেষণাকালীন সময়ে ডঃ আহমদ শরীফের বই-পত্রের বিশাল ভান্ডার থেকে কিছু বই-পত্র ও স্মারকগ্রন্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন যাহেদ করিম স্বপন। 'স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ' এর সাধারণ সম্পাদক হাসান ফকরী এই গবেষণার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের মূল্যবান তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন।

এই গবেষণায় আরো কিছু মূল্যবান তথ্য দিয়ে উপকৃত করেছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রতন সিদ্দিকী। বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন লালমাটিয়া মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক সৈয়দা নাজনীন আখতার।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন মোঃ আলাউদ্দিন। কম্পিউটার বিপর্যয় ও নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে অভিসন্দর্ভের অক্ষর বিন্যাসে সহযোগিতা করেছে অনুজ আব্দুলাহ্ আল-মামুন ও প্রীতিভাজন দিদারুল ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাকালে আমার প্রধান নির্ভরতা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার । এছাড়া বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, পাবলিক গ্রন্থাগার, উত্তরা হাই স্কুল এ্যন্ড কলেজ লাইব্রেরী থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই ও উপাদান সংগ্রহ করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই অভিসন্দর্ভ রচনায় যাঁর সাহায্য ছাড়া হাতে কলম তুলে নিতে সাহস পেতামনা, তিনি আমার মা। যিনি আমার সংসারকে আগলে রেখেছেন সাধ্যাতীত শ্রম ও সময় দিয়ে।

বাবার উৎসাহ, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের প্রেরণা এবং আমার স্বামীর বারবার তাগিদে আমার কাজের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। তাদের সকলের নিকট আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

মোছাঃ দীল আফরোজা খানম

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা ০১-০২

প্রথম অধ্যায়: সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী : স্বরূপ অনুসন্ধান ০৩-৩১

১. সংস্কৃতির স্বরূপ
২. সংস্কৃতি সম্পর্কে চিন্তকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মত
৩. জাতীয় সংস্কৃতি
৪. বুদ্ধিজীবীর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক,আন্তর্জাতিক ও প্রযুক্তিগত প্রভাব ৩২-৫৭

১. রাজনীতিতে সংস্কৃতি
২. আর্থ-সামাজিক অবস্থা
৩. প্রযুক্তির বিকাশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির রূপান্তর

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের সংস্কৃতি চিন্তার ধারা ও স্বরূপ ৫৮-১১৫

১. ঐতিহ্যগত ধারা
২. উদারনৈতিক ধারা
৩. সমাজতান্ত্রিক ধারা

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী ১১৬-১২৮

১. বুদ্ধিজীবীদের মানস-প্রবণতা ও সামাজিক ভূমিকা
২. রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

পঞ্চম অধ্যায়: উপসংহার ১২৯-১৩১

গ্রন্থপঞ্জি ১৩২-১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

'সংস্কৃতি' কথাটি বিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের চিন্তাবিদদের, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত। বাংলা ভাষায় কালচার অর্থে সংস্কৃতি ছাড়াও অনুশীলন, কৃষ্টি, শিক্ষা, তমুদ্দন ইত্যাদি শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সংস্কৃতি স্থিতি লাভ করেছে। শব্দগুলোর বিভিন্নতার মধ্য দিয়ে অন্তর্নিহিত ধারণারও পরিবর্তন হয়েছে। বিভাগ-পূর্ব বাংলার ধারণার সাথে বিভাগোত্তর বাংলার সংস্কৃতি ধারণার পার্থক্য দেখা যায়। আবার পাকিস্তান আমলের সংস্কৃতিচিন্তার সাথে বাংলাদেশের সংস্কৃতিচিন্তার পার্থক্যও চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিক থেকে সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণার অভিব্যক্তি যেভাবে ঘটেছে তাতে তিন দশকের সংস্কৃতিচিন্তা কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী-সমাজও জাতীয় সংস্কৃতির গতিধারা নির্ধারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সংগঠিত বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ দ্বারা তাঁদের ভূমিকা স্পষ্ট হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং জাতীয় চিন্তাধারায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়। এই প্রাসঙ্গিকতার বিবেচনা থেকেই বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী সমাজের ভূমিকা গুরুতর অনুসন্ধানের বিষয়।

আমার জানা মতে, বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়ে কোন প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা হয়নি। সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য, চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য প্রভৃতি আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে গত প্রায় তিন দশকে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বা অর্জিত হয়েছে এবং এই পরিবর্তন ও অর্জনের সাথে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার স্বরূপ যাচাই করা এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। আমাদের জাতীয় চিন্তাধারায় ও সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই মানুষ ব্যক্তিগতজীবন থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনে সুন্দর কল্যাণ ও ন্যায়ের ভিত্তেতে সুষম সমাজ গঠন করতে পারে। আর সেজন্যই এই গবেষণায় গুরত্ব দেয়া হয়েছে সংস্কৃতিকে এবং সংস্কৃতির সাথে জড়িত বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতিকে। গবেষণায় বিবেচনাধীন সময়ের সংস্কৃতির যে বিশিষ্টতা ও এই প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে বুদ্ধিজীবীদের যে ভূমিকা, তা তুলে ধরাই এই গবেষণার লক্ষ্য।

প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃতির স্বরূপ, সংস্কৃতি সম্পর্কে চিন্তকদের দৃষ্টিভঙ্গি, জাতীয় সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে পূর্ববর্তীদের চিন্তাও তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিন দশকের রাজনৈতিক পালাবদল ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে রাজনৈতিক পালাবদলের প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরবার প্রয়োজনে নেতৃত্বের প্রকৃতিকে বুঝবার জন্য নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ও সংকটকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং প্রাসঙ্গিক হিসেবে আর্থ-সামাজিক, আন্তর্জাতিক ও প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতিচিন্তার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের নির্বাচিত কয়েকজন চিন্তকের সংস্কৃতি চিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের মানস-প্রবণতার বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতে সামাজিক ভূমিকার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীর অংশগ্রহণ সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে তা তুলে ধরবার জন্য কয়েকটি রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাহায্যে, ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তুলবার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী: স্বরূপ অনুসন্ধান

১.সংস্কৃতির স্বরূপ

বিভিন্ন চিন্তকের সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞাগুলোর মমার্থ ও তাদের নৈকট্য-দূরত্ব, সীমা-পরিসীমার বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির স্বরূপ বোঝা যায়। চিন্তকদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য মতভেদ তৈরী করলেও এর মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতির সত্যিকার স্বরূপ উৎঘাটনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রচলিত সংজ্ঞার সাথে নিজস্ব অনুসন্ধান সংস্কৃতির স্বরূপ স্পষ্ট করবার জন্য সহায়ক হবে।

প্রথমত, সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে বিভ্রান্তিগত একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যায়। 'সংস্কৃতি' শব্দের ব্যবহার বহুস্থলে, অগণিত মানুষের অগণিত মনের মত। এর ফলে সংস্কৃতি যে উৎকর্ষ লাভ করেনি তা নয়, বহুমাত্রিক ব্যবহারের কারণেই হোক , আর মাত্রাজ্ঞানহীন বাড়ন্ত বিশালতার দায়ে দন্ডিত হয়েই হোক শব্দটির ব্যবহার বিভ্রান্তি এড়ানো যায়নি। এই বিভ্রান্তিকে প্রাচীন একটি বটবৃক্ষের স্বরূপগত বিভ্রান্তির সাথে তুলনা করা যায়। প্রাচীন বটবৃক্ষের ঝুরিগুলো যখন ঝুলে গিয়ে মাটির সাথে বটবৃক্ষের পাশাপাশি অবস্থান নেয় আর বটবৃক্ষের মূল শেকড়ের সাথে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে তখন আর বুঝবার উপায় থাকে না মূল শেকড়ের অবস্থান কোথায়? প্রশ্ন জাগে একটি গাছ থেকে এত গাছ কি করে হয়? এত বড় পরিসরের নান্দনিক সৌন্দর্যের অস্তিত্বে কৌতূহলী দর্শনার্থী বিভ্রান্ত হয় অনেক সময়। হয়ত বৃক্ষবয়সী কোন মানুষ সাধারণ লোকাভিজ্ঞতা থেকে তার সঠিক স্বরূপ বলে দেয় অথবা সেও নানা প্রশ্নের জটিলতায় চিহ্নটি আর মনে করতে পারেনা। শুরু হয় শেকড়ের সন্ধান। সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয়ও বটবৃক্ষের স্বরূপ নির্ণয়ের মত দুরূহ জটিল কাজ। প্রতিদিনের দেখা, চেনা বস্তুকে চেনা চেনা মনে হলেও অচেনা অধরা থেকে যায়। তাই সহৃদয়তা ছাড়া প্রাণের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতির ব্যক্তিরূপ আছে, সামষ্টিকরূপ আছে, আছে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় রূপ। ব্যক্তিগত জীবনদর্শন বা ব্যক্তিগত সংস্কৃতি সামষ্টিকতা থেকে জাতীয় রূপ পেতে পারে; আবার রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় সংস্কৃতি ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিরূপ পেতে পারে। তবে ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বেশী থাকে। সমষ্টি থেকে জাতীয় রূপেও স্বাতন্ত্র্য থাকে তবে তা ব্যক্তির মত নয়। ব্যক্তির বৈচিত্র্যের সবটাই সমষ্টিতে ঠাঁই পায় না। যাচাই বাছাইকৃত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সব গুণ নয়, কোন কোন বিশেষ গুণ অন্যের গুণের সাথে মিলেই হয় সমষ্টি। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য দশের মধ্যে এগার হওয়ার মধ্যে, সমষ্টির স্বাতন্ত্র্য এক সমাজ থেকে অন্য সমাজের বা অঞ্চলের, আর রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য দেশ থেকে দেশান্তরের। এত সব কিছুর স্বাতন্ত্র্য নিয়েই কালচারের স্বরূপ বুঝতে হবে। কারো চিন্তায় ব্যক্তি, কারো চিন্তায় সমষ্টি, রাষ্ট্র ,জাতি প্রাধান্য পায়। কিন্তু সব মিলিয়ে নিলে কালচারের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।

এজন্য কেউ মন্দিরে, কেউ মসজিদে, কেউ প্যাগোডায়, কেউবা গীর্জায়,কেউ পাঠশালায়,কেউ 'ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ' জ্বেলে জীবন সাধনা করে। ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে যারা জীবনের ফুল ফোটায় তারা প্রেমিক, তারা ইন্দ্রিয়গুলোকে ছন্দ-সুর-ছবিতে নবজন্ম দান করতে পারে। তাদের আত্মসৃষ্টিই সংস্কৃতি। এই স্বধর্ম ও ব্যক্তিগত জীবন দর্শনই সংস্কৃতি। আবার কেউ যদি পূর্ব পুরুষদের অনুসরণে মন্দিরে মসজিদে গিয়ে আত্মসৃষ্টি করতে পারে তবে তা অবশ্যই সংস্কৃতি; আর যদি আত্মাকে মেরে ফেলে তবে তা সংস্কৃতি হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মন্তব্য স্মরণীয়:

"ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার আর কালচার শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম। কালচার মানে উন্নত জীবন সম্বন্ধে চেতনা- সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিতি। সাধারণ লোকেরা ধর্মের মারফতেই তা পেয়ে থাকে। তাই তাদের ধর্ম থেকে বঞ্চিত করা আর কালচার থেকে বঞ্চিত করা এক কথা।"[১]

"মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতে, সংস্কৃতি বা কালচার শিক্ষিত ও মার্জিত লোকের ধর্ম। তাই সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র সমাজ নয়, ব্যক্তি। কারণ জীবনের শ্রেষ্ঠ ও বহুভঙ্গিম প্রকাশ নিজের দিকে তাকিয়েই হয় সমাজের দিকে তাকিয়ে নয়। তবুও সংস্কৃতিবান মানুষ অসামাজিক নয়। সংস্কৃতিবান ব্যক্তিতান্ত্রিক এই অর্থে যে সমাজ বা অর্থনীতির কথা ভেবে সে নিজের অসৌন্দর্যকে ক্ষমা করে না। যেহেতু ধর্মের অর্থ জীবনের নিয়ন্ত্রণ এবং মার্জিত আলোকপ্রাপ্তরা কালচারের মাধ্যমেই

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, তাই তাদের জন্য ধর্মের ততটা দরকার হয় না। কিন্তু সাধারণ মানুষ উপায়গুলোকে অবলম্বন করতে পারে না বলেই তারা ধর্মের মধ্য দিয়ে কালচারের সাধ পেয়ে থাকে।"[২]

"বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বে মানুষের সামাজিক সংজ্ঞা, সামাজিক কর্তব্য ও সমাজ গঠন সম্পর্কেও বক্তব্য আছে। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, সেজন্য মানুষের বৃত্তিসমূহের পারস্পারিক সামঞ্জস্যের ও সুষম বিকাশের প্রশ্ন সমাজকে বাদ দিয়ে বেশীক্ষণ আলোচিত হতে পারে না। অনুশীলনতত্ত্বে বিবৃত অনুশীলনও সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে বেশী দূর চালানো যায়না। অনুশীলনতত্ত্বে মানুষকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ব্যক্তিমানুষরূপে গণ্য করা হয়নি, ব্যক্তি মানুষকে সমাজের ও ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিচার করা হয়েছে। অনুশীলনকে 'সংস্কৃতি' অর্থে গ্রহন করে বাঙালি সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি, জাপানী সংস্কৃতি, মার্কিন সংস্কৃতি, ফরাসি সংস্কৃতি, উপজাতীয় সংস্কৃতি, উপসংস্কৃতি, মুসলিম সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি, মধ্যযুগের সংস্কৃতি এসব কথার অর্থ অনুসন্ধান করলে অনুশীলনের কিংবা সংস্কৃতির বৈচিত্র্য উপলব্ধি করা যায়।"[৩] বঙ্কিমচন্দ্রের "The Substance of Religion is Culture-মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধম্ম।"[৪] অনুশীলনতত্ত্বে ব্যক্তি থেকে জাতি, বা জাতি থেকে ব্যক্তি যেভাবেই দেখা হোক না কেন, তাকে একভাবে একসূত্রে বাধা মনে হয়। যে চিত্তশুদ্ধির জন্য তারা ব্যক্তিগতভাবে শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ খ্রিষ্টান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ পজিটিভিস্ট (Positivist) আবার তার অভাবে তারা সংস্কৃতিহীন। কারণ "চিত্তশুদ্ধি নিতান্ত মানসিক ব্যাপার নয়, এর পরিচয় প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সর্বপ্রকার বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে। কাজ ছাড়া অনুশীলন তথা সংস্কৃতি হয় না। আর অধিকাংশ কাজই সামাজিক কাজ বা যৌথ জীবনের কাজ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সব কাজই অনুশীলন বা সংস্কৃতিতে বিবেচ্য। সংস্কৃতির গুরুত্ব কাজের মধ্যে যতটা তার চেয়ে বেশী কাজের পেছনে চিন্তাগত প্রস্তুতিতে।"[৫]

বাংলা ভাষার সংস্কৃতিতে চিন্তাগত প্রস্তুতি কেমন তা দেখবার জন্য সংস্কৃতির কয়েকটি সংজ্ঞা বিশেস্নষণ করা যায়:

Dhaka University Institutional Repository

নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন- "কালচার বলতে ভূমি চাষ করা যেমন বুঝায় , তেমনই বুঝায় বীজের সংস্কার সাধন, তেমনই বুঝায় মানুষের জীবনভূমির চাষ, আত্মোন্নতি সাধন, শিল্পসাহিত্যাদির চর্চা, refinement ইত্যাদি সমস্তই।"[৬] তিনি চাষবাসের সাথে, কর্ষণকর্মের সাথে সংস্কৃতির গভীর সম্পর্কের কথা বলেছেন, যাকে প্রত্যেক কালের উপযোগী করে নিতে হয়। অতুলচন্দ্র গুপ্ত সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হিসেবে বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চা ও তার আকর্ষণকে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু " জৈব প্রয়োজনের খাদ থেকে শোধন সংস্কৃতির লক্ষণ"[৭] বলে মনে করলেও মানুষের মনের উপর তার আনন্দলোকের আকর্ষণের বিপদও লক্ষ্য করেছেন। কাজী আবদুল ওদুদ ধর্মের স্থলে সংস্কৃতির প্রতিস্থাপন প্রসঙ্গের সাথে সাথে বলেছেন, "সেকালের ধর্মের মতো এ কালের সংস্কৃতিরও মূল কথা হওয়া চাই সামাজিক উৎকর্ষ লাভ।"[৮] তিনি সংস্কৃতির ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রবণতার দুর্বলতা লক্ষ্য করে সংস্কৃতির সমাজবোধকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন "যা কিছু মানবিক তথা প্রাকৃতিক তাই ও তার সবটাই সংস্কৃতির অন্তর্গত।"[৯] কামাল লোহানী সংস্কৃতিকে সামাজিক রাজনৈতিক চেতনার অর্জন ও ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে বলতে চেয়েছেন 'জনগণের সংগ্রামী চেতনাই আমাদের সংস্কৃতি।' বাংলাদেশের সুদীর্ঘ গণ আন্দোলন ও গণজাগরণ এর সার্থকতার সাথে জড়িত প্রগতিশীল শক্তি ও প্রচলিত রক্ষণশীল শক্তির প্রভাবের দুটো রূপ তিনি লক্ষ্য করেছেন এবং তাঁর মতে, "জয়লাভ করে পরিবর্তন এবং নতুন।"[১০] এই পরিবর্তনের সূত্র গোপাল হালদার মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনের সাহায্যে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন-"সংস্কৃতি শুধু মনের বিলাস নয়, শুধুমাত্র মনের সৃষ্টি সম্পদও নয়। উহা বাস্তব প্রয়োজনে জন্মে এবং মানুষের জীবসংগ্রামে শক্তি জোগায় জীবন যাত্রার বাস্তব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।"[১১] জীবন সংগ্রামের শক্তি ও প্রেরণা মানুষই পায়। মানুষের অন্তরের ও বাইরের প্রকাশভঙ্গিতে তার প্রকাশ ঘটে। ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম বলেছেন,"সকল বাহ্যিক আচার আচরণের মূলে আছে বিশেষ জাতির চিত্তসত্তার মূল্যবোধ ও তার প্রকাশভঙ্গি। সম্ভবত এর বহিঃপ্রকাশের স্বরূপই প্রকৃত সংস্কৃতির রূপ।"[১২] মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ্ও এরকম মত প্রকাশ করেছেন, তবে আরও জোরালো ভাবে। তিনি "মানুষের অন্তর ও বাহির; উভয়ের সম্প্রসারণকে সংস্কৃতি বলেছেন কিন্তু তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ যেমন, নাচ-গান-আবৃত্তি ইত্যাদিকে সংস্কৃতি মনে করা জীবনের পক্ষে মারাত্মক মনে করেছেন।"[১৩] মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বলেছেন- "সংস্কৃতির অর্থ সুন্দর সুষম জীবন চর্চা, যা কিছু জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

সুস্থ সুন্দর বিকাশে সাহায্য করে তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির বিধি-বিধানও রচিত হবে জীবনের এই সুস্থ সুন্দর বিকাশের লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখেই। ... অবশ্য জীবনের সুষ্ঠু ও সুন্দর বিকাশে ধর্ম যেখানে সহায়তা করে, সেখানে ধর্মও সংস্কৃতির পরিপোষক বটে। অতএব, ধর্ম ও সংস্কৃতি যে সর্বত্রই পরস্পরের প্রতিবাদী হবে এমন কোন কথা নেই।"[১৪] "...এই সংস্কৃতিই জীবনের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছন্দ ও সুষমা আনয়ণ করে; শতদলের মতো বিচিত্র দিকে মেলে দেওয়া জীবনের পাপড়িগুলির মধ্যে একটা মৌল সংস্কৃতির রাগিনী বেধে দেয় এই সংস্কৃতি। এককথায় বলতে গেলে সংস্কৃতি মানুষের জীবনের সুস্থ বিকাশের ও সমন্বয়ের রূপ।"[১৫] সমন্বয় করতে হলে বহুর মধ্যে যাচাই বাছাই করতে হবে। সমন্বয় করতে গেলে ঐক্য দরকার। "যে বহুত্ব ঐক্যে উপনীত হয়না তা বিশৃঙ্খলা; যে ঐক্য বহুত্বের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না তা জুলুম।"[১৬]

"আমাদের সংস্কৃতিতে বিরাজমান হতাশা , লক্ষ্যহীনতা, অবৈজ্ঞানিকতা এবং আমাদের অর্থনীতিতে দারিদ্র্য ও বিদেশী নির্ভরতা সব কিছুর মূলেই আছে শ্রেণীবিভাজন।"[১৭] এই শ্রেণীবিভাজনের জন্যই ব্যক্তিগত সংস্কৃতি চর্চা ব্যাহত হয়, সমষ্টিগত সংস্কৃতিচর্চা ব্যাহত হয়, গড়ে ওঠে না ঐক্যবোধ। আমাদের সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ধারিত হওয়া উচিত জাতীয় ভাবে। আবুল কালাম শামসুদ্দিন মনে করেন, "চিন্তাধারা, বিশ্বাস আচার-আচরণের প্রতিফলনের ফলে মানুষের জীবনের বিশিষ্ট রূপায়নকেই সাধারণত বলা হয় তার সংস্কৃতি বা তমুদ্দন। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, এই কারণে সমাজবদ্ধ জনসমাগমের ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস সংস্কারের প্রভাবও তার ব্যক্তি জীবনের রূপায়নে রেখাপাত করে। সে রেখাপাত যতটা ব্যক্তি জীবনে লক্ষ্যযোগ্য, তার চাইতে বেশী এর প্রকাশ ক্ষেত্র হচ্ছে সমাজবদ্ধ জীবন। ফলত-সমাজটাই হচ্ছে সত্যিকারের তমুদ্দনের বিকাশ ও প্রকাশ ক্ষেত্র। কারণ মানুষ ঘনিষ্টভাবে ঐকবদ্ধ হয় সমাজক্ষেত্রেই এবং সেখানেই তার একটা একক বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠে। সামাজিক জীবনের এই একক বিশিষ্ট রূপটাই হচ্ছে তার তমুদ্দন।"[১৮] তাঁর মতে, দৈশিক সীমাবদ্ধতায় তা গড়ে উঠতে পারে যদি সামাজিক, ঐক্যবোধ থাকে। বাঙালি সংস্কৃতি আর জাতিত্ববোধ এক জিনিস নয়। সংস্কৃতির প্রতিফলন সামাজিক একাত্মতায় আর জাতিত্ব নির্ভরশীল রাজনৈতিক ঐক্যদ্ধতায়। তিনি মনে করেন, "যেখানে জাতীয়তাই সম্ভবপর হয়ে উঠে নাই সেখানে সাংস্কৃতিক ঐক্যের কথা উত্থাপন করা ব্যর্থ বিড়ম্বনা মাত্র।"[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তা না থাকলে সামাজিক ঐক্য বিড়ম্বিত হয় আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বা ব্যক্তিগত জীবন দর্শন বা স্বধর্মানুসারী ব্যক্তিকে সমাজ, রাষ্ট্রের কাছে অসহায় হয়ে থাকতে হয়। কারণ ব্যক্তি সবসময় সমাজ, রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করতে পারেনা। মনুষ্যত্ব, মানবীয় গুণ সবক্ষেত্রে প্রধান হয়ে ওঠে না , বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রধান্য পায় ব্যক্তি রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা। তাই ব্যক্তির সংস্কৃতি, জাতীয় সংস্কৃতির মূল হলেও জাতীয় সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেই ব্যক্তিগত সংস্কৃতিচর্চা করতে হয়। সেখানে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন অবশ্যই ঘটবে। যে গুণের সে যোগ্য হতে চায়, সেই রূপে আত্মপ্রকাশ করবার জন্য নিজেকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে। তারপর একে একে নানা রঙ রেখা তুলিতে নিজের একটি অবয়ব দাঁড় করায়। এ আকার দিতে গিয়েই সে ভাস্করের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ভাঙ্গা-গড়ার, গ্রহণ-বর্জনের, ভাল-মন্দের, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের, সুন্দর-কুৎসিতের মিল-অমিল খোঁজে। একসময় সবকিছুকে মিলিয়ে মেলায়ে আত্মপ্রকাশ করে। ব্যক্তির এই সত্ত্বা নতুন। তার অন্তরের এই সত্ত্বা তার লালিত নতুন মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধের জন্যই সে তার রুচি অনুযায়ী সবকিছু যাচাই করতে শিখে। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত মানসভূমির সাথে, এই নতুন মানসভূমির পার্থক্য ঘটে। তাই প্রথমে সে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মানসভূমির কোনটির উপযোগিতা আজও আছে, কোনটির নাই, কোনটি ভগ্নস্বাস্থ্য, কোনটি মৃতপ্রায়, কোনটির উজ্জীবন দরকার, কোনটি আগাছা মূল্যের, এগুলোকে যাচাই করে নেয়। এভাবে যাচাই করে নিজেকে উপযোগী করে তোলার বিরামহীন অনুশীলনের দায়িত্ব সে স্বীকার করে থাকে। নিজস্ব জীবন দর্শন এবং অর্জিত জীবন দৃষ্টি দিয়ে ব্যক্তি তার নিজের আচরণিক পরিবর্তন ঘটায়।

একজন মানুষের ভাবনা চিন্তায় আচরণে কি কি লক্ষণ স্পষ্ট হলে তাকে সংস্কৃতিবান বা কালচার্ড (Cultured) বলা যায় সেটি পরিস্কার হওয়া দরকার। তার আগে বলা দরকার, সংস্কৃতি শব্দটি আক্ষরিক অর্থ দিয়ে বা একটিমাত্র সরল, যৌগিক কিংবা জটিল বাক্য দিয়ে বোঝানো যেমন সম্ভব নয়, তেমনি একজন 'কালচার্ড'কেও সম্ভব নয়। তবে নানা সংজ্ঞার সংশেস্নষণ বিশেস্নষণ ঘটিয়ে সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিমান চেনা যায়। যার ব্যক্তিগত জীবন ও সংস্কৃতি যেমন তার সংস্কৃতিমানতাও তেমন। কালচার্ডকে বুঝতে হলে তাই কালচার বুঝতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে। কালচার হলো বৃহৎ ব্যাপার । করণ তাতে ব্যক্তি জীবন থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত রীতি-নীতি আচার-আচরণ সবকিছুর সমাবেশ ঘটে। কিন্তু 'কালচার্ড' শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত রূপ। একটি স্থির বস্তু যখন বাইরের কোন বল প্রয়োগে চলতে থাকে তখন বস্তুটি সমবেগে চলতে থাকে। এই চলমানতা বস্তুটির ধর্ম। চলতে চলতে বাঁক নেয়, গতি বদলায়, রূপ বদলায়, অথবা বদলে যায়। যেতে যেতে পথে পথে বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে শেখে, আবার চলতে থাকে, সে ক্লান্ত হয় না। এ তার প্রবণতা, সে চলে এবং চলতে শেখায়। কালচার ও কালচার্ড এর স্বরূপ ঐ বস্তুর মত। ব্যক্তি যদি হয় বস্তুটি, বাইরের বল যদি হয় ব্যক্তির প্রেষণা, সমাজ যদি হয় তার বিচরণক্ষেত্র, তবে সমাজের সাথে ব্যক্তি সত্তাটির প্রতিদিনের আচরণে, কর্মে, ভাবের বিনিময়ে সে হয় পরিশ্রুত। "এই পরিশীলিত ও পরিশ্রুত জীবন চেতনা-ই সংস্কৃতি"[২০]। এই জীবন চেতনা-ই ব্যক্তি-সমষ্টি-জাতিতে নানা রূপে, নানাভাবে বিদ্যমান থাকে বা বিকাশমান অবস্থায় থাকে। স্থান ও কালের পার্থক্য সত্ত্বেও সুন্দর ও কল্যাণকে যে মননে ধারণ করে সেই সংস্কৃতিবান। সুন্দর ও কল্যাণের জন্য নিজেকে নিবেদিত ব্যক্তি, নিজের মত করে নিজেকে পরিশ্রুত ও আত্মসৃষ্টি করে থাকে। এ সাধনায় সে জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু, সতর্ক ও সাবধানী। অতিযত্নের সাথে, সংযমের সাথে, ধৈর্য্যের পরীক্ষায় সে প্রতিনিয়ত সশস্ত্র যোদ্ধাকেও হার মানায়। এ প্রসঙ্গে একটি ভাষ্য- " সংস্কৃতিমানই ধীর বুদ্ধির, স্থির মেজাজের যুক্তিবাদের ও যৌক্তিকতার ধারক, সংস্কৃতিমানই ন্যায় নিষ্ঠ সৎ মানুষের সহায় ও সৎ কর্মের সমর্থক। "[২১] এই গুণগুলো কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট সময়ের অর্জন নয়। সময়ের চাহিদা মিটিয়েও তা সময়ের অতীত। প্রতিটি যুগের, প্রতিটি কালের মানুষ এই আদর্শেরই হতে চায় এবং তার জন্য সাধনা করে। এজন্যই বলা হয় " সৌন্দর্য ও মহত্বের সাধনাই সংস্কৃতি"[২২]।

সুন্দর ও মহত্বের সাধনাকে স্থান ও কাল দিয়ে বাঁধা যায় না। এটি সত্য যে একেক কালের সৌন্দর্য ও মহত্ব ভাবনার প্রেক্ষাপট ভিন্ন হয়। কিন্তু এই বোধের প্রতি আবেদন-নিবেদন থাকে দেশ কালের সীমানার বহুদূরে, চিরন্তনতায়। সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তৃত পরিচয়ের কিছু ফাঁক থেকে যাবে যদি মহত্বের সাধনায় স্থুল ও সূক্ষ্ম রুচিবোধের পার্থক্য ও সমন্বয়ের কথা না বলা হয়। স্থুল প্রয়োজন, সূক্ষ্ম প্রয়োজনের মধ্যে কেউ কেউ কখনও কখনও পুরো ধারণাকে গুলিয়ে ফেলেন। অথচ স্থুল ও সূক্ষ্ম প্রয়োজনের চরিতার্থতার মধ্যে নিহিত থাকে প্রকৃত সংস্কৃতিমানতা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনের সীমারেখায় যে জীবন, স্থুল জৈবিক প্রয়োজন যার মূল ভিত্তি, তার প্রয়োজনানুযায়ী চরিতার্থতা ছাড়া সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলোর বাঁধন হবে শেকড় ছাড়া। এই খাপছাড়া ভাসা ভাসা বাঁধন দিয়ে উচ্চতর 'অপ্রয়োজনীয় সূক্ষ্মবোধে'র জন্ম সম্ভব নয়। তাই মহত্বের সাধনায়, জীবন সাধনায়, মনুষ্যত্বের সাধনায় সংস্কৃতির অখন্ডতা প্রয়োজন। ''মনুষ্যত্ব তথা মানবধর্মের সাধনায়-ই সংস্কৃতি এবং একমাত্র এই সাধনাই জীবনকে করতে পারে সুন্দর ও সুস্থ্য।''[২৩]

মহত্বের সাধনা করতে গিয়ে প্রাণের দাবীর ভিত্তি অনেক বড়। প্রাণ না থাকলে শুধু মন অস্তিত্বহীন। যদি প্রাণ থাকে তবেই মনের যত্ন নিলে মন বিকশিত হয়। তখন সে মনের গুরুত্বও বেশী হয়। প্রাণহীন মনের মূল্য কেউ দেয় না, এ বঞ্চনার জন্য কেউ দায়ী নয়-এ হচ্ছে গুরুত্ব। গুরুত্বের আলোচনায় দুপক্ষ দুদিকে দুইটি মতবাদ খাড়া করতে পারবে কিন্তু এরা হবে পরস্পর বিরোধী। পরস্পরকে মিলিত করতে হলে ভিত্তির উপর-ই রচনা করতে হবে মহত্বকে। ভিত্তির বাইরে এ মহত্ব চর্চা ফাঁকা বুলি, বৃথা বিলাস। এ প্রসঙ্গে একজনের মতামত তুলে ধরা যায়:

'' লক্ষ বস্তু হিসেবে উপরের তলাটা যতই মূল্যবান হোক না কেন গুরুত্বের দিক থেকে ভিত্তিটাই বড়। কাজেই যে পিতা বা মাতা চাল কিনতে গিয়ে সুন্দর শিল্পদ্রব্য কিনে নিয়ে এসে গোটা পরিবারকে উপবাসী রাখে কিংবা অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে না পারলেও ছেলেমেয়েদের মাইনে দিয়ে গানের মাস্টার রাখে, যে আত্মমগ্ন ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্থ পরিজনের সংবাদ না নিয়ে সগৌরবে ললিত কলা বা বিশ্ববিদ্যায় উচ্চমার্গে বিচরণ করে অথবা যে সমাজ রোগ-শোক দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জনসাধারণের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে ব্যয়বহুল বিলাস-জৌলুসের আয়োজন করে, মুষ্ঠিমেয় লোকের কৃতিত্ব বা সৌখিন সংস্কৃতির ছটায় মুগ্ধ হয়ে দেশব্যাপী বঞ্চনা, অশিক্ষা ও মর্মযাতনার কথা ভুলে যায়- সেই পিতামাতা সেই ব্যক্তি বা সেই সমাজের মানস কাঠামোতে সুবুদ্ধি সুরুচি বা সুনীতির পরিচয় আছে কিনা তার মীমাংসা কঠিন নয়।''[২৪]

মানুষের এ দুয়ের সাধনায় একান্ত রুচির পার্থক্য থাকবেই, কখনই তার সুসমন্বয় হয়ত সম্ভব নয়। লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লক্ষ্যটাই তার চরম ও পরম মনে হয়। পরম পাওয়ার জন্য সে প্রেমিক হৃদয় ক্ষুৎপিপাসাকে অনেকখানি ভুলে থাকে। প্রয়োজনকে অনেকসময় দূরে রাখে। তবে তাকে মাত্রাজ্ঞানহীন হলে চলে না। যেমন বাড়িতে কোন মেহমান এলে কেউ কেউ শুধুমাত্র খাবার দাবার পরিবেশনে মনোযোগী হন, আবার কেউ কেউ

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্ব দেই গল্পগুজবে। এজন্য কেউ নানা রেসিপি তৈরী করে আপ্যায়নে সৌজন্য ও সুরুচির পরিচয় দেন, আবার কেউ গল্পের পর গল্প বাড়িয়ে চলেন, আপ্যায়নের ব্যাপারটা খেয়ালই করেন না। এখানে দুটোর শুধু একটিকে গুরুত্ব দিলে কালচার থাকে না। মাত্রাজ্ঞান ঠিক রেখে প্রয়োজন ও সৌন্দর্যকে একসাথে বেঁধে দিতে পারলেই চলে, তবে বৈচিত্র্য থাকবেই। কালচারের এই বৈচিত্র্য বৈষম্য নয় বরং কালচারের বৈচিত্র্য সমস্ত সুন্দরের বিকাশমান শর্ত। তাই কালচারের বৈচিত্র্য অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে আবুল মুনসুর আহমেদের একটি সুন্দর চিন্তা আছে- "ধরুন , এমন যদি হইত, দুনিয়ার সব জাতি যদি পশ্চিমা কালচার গ্রহণ করিত, তবে অবস্থা কি দাঁড়াইত? সভ্যতার দিক হইতে দুনিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে, কালচারের দিক হইতে তেমনি সব জাতি এক রঙা হইয়া যাইত। তাতে কার কি লোকসান হইত? মানবতার লোকসান হইত দুই দিক হইতে। প্রথমত দুনিয়ার বৈচিত্র্য নষ্ট হইত। বিভিন্ন জাতীয় বৈশিষ্টের অবসান ঘটিত। হাজার ফুলের বাগিচা যে দুনিয়া, সেটা পরিণত হইত এক- রঙা গেন্ধা ফুলের ক্ষেত্রে। দুনিয়ার সব জাতি নকল পশ্চিমা জাতিতে পরিণত হইত।"[২৫]

জাতির ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তির দিক থেকেও চিন্তাটা গুরুত্বপূর্ণ। মহত্বের, সৌন্দর্যের, কল্যাণের, চিত্তোৎকর্ষের, মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যক্তি করবে, সেটি যেভাবেই করুক না কেন সেটিই তার বৈচিত্র্য। এ বৈচিত্র্য হতে পারে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে এক ক্রোশ থেকে আরেক ক্রোশের, মাইলের পর মাইলের, দেশ থেকে দেশান্তরের। আবুল মুনসুর আহমেদের আরেকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরবার প্রয়োজন আছে-

"মনে রাখা দরকার ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেমন জাতির ব্যক্তিত্ব তেমনি, কদাচ নিখুঁত, ত্রূটিহীন হইতে পারে না। মারিয়া পিটিয়া যেমন ব্যক্তিত্ব হয়না ছাচে ঢালিয়া তেমনি কালচার হয় না। কালচারটা ডিজাইন করা কনষ্ট্রাকশন নয়। গোটা গাছের মতই ন্যাচারাল গ্রোথ। বলা যায় ওটা প্রকৃতির তৈরী নদী। মানুষের হাতে তৈরী কাটা খাল নয়। দুই কুল ছাপিয়া দুই পার ভাঙ্গিয়া ইচ্ছামত চলাই নদীর ব্যক্তিত্ব কৃত্রিম খালের মত তার দুই পার শানে বাঁধা নয়। এজন্যই দোষে গুণে যেমন ব্যক্তিত্ব ভাল মন্দেই তেমনি কালচার। দুনিয়ার সব কালচারের শুধু গুণগুলো বাছিয়া লইয়া একটা নিখুঁত সুন্দর কালচার গড়িবার চেষ্টা করিয়া দেখুন পারিবেন না। সেটা কালচার হইবে না, হইবে বড়জোড় কালচারের ল্যাবরেটরী। মিউজিয়াম হইবার সম্ভাবনাই বেশী।"[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতির তৈরী নদী যেমন ইচ্ছেমত চলে এবং গতি বদলায় বাঁক নেয় নতুন দিকে, রূপান্তর ঘটায় নিজের স্বরূপের, তখনই তা কালচার। অবশ্য এই গতির সাথে, বাঁকের সাথে, রূপান্ত রের সাথে, পরিবেশ পরিস্থিতি, ভৌগোলিক অবস্থান, সামর্থ্য শক্তি নির্ভরশীল অনেকাংশে, সর্বাংশে নয়।

জীবন ধারা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়, আবার ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করে নিতে হয়, এই পরিবর্তন করে নিতে হলেই চিন্তা চেতনার দরকার হয় যা কখনও ব্যক্তি কখনও সমষ্টির চিন্তা চেতনার ফলশ্রুতিতেই ঘটাতে হয়। এ সম্পর্কে আবুল কাসেম ফজলুল হকের মন্তব্য:

"সংস্কৃতি হলো জীবনের ও পরিবেশের উৎকর্ষ সাধনের ও উন্নতি বিধানের এবং ইচ্ছানুযায়ী ইতিহাসের গতি নির্ধারনের চিন্তা ও চেষ্টা। জীবন ও পরিবেশ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। জীবন পরিবেশ থেকেই উদ্ভুত এবং পরিবেশের সঙ্গে সংলগ্ন এবং পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। এ দু'য়ের একটির উন্নতি অন্যটির উন্নতির উপর নির্ভরশীল। উন্নতি আপনিতেই ঘটে না, সাধন করতে হয়। উন্নতির প্রক্রিয়ায় মানুষ কর্তা। একমাত্র মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, অন্য প্রাণীর নেই। মানুষ সেই জৈবিক সামর্থের অধিকারী যার বলে সে ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রয়াসে সংস্কৃতির পরিচয় দিতে পারে। বিবর্তনের যে পর্যায়ে এসে মানুষ সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে সামর্থ হয়েছে তার পূর্ব পর্যন্ত অন্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য ছিল না। জীবন যাত্রার মধ্য দিয়ে মানুষের নিজেকে এবং নিজের সঙ্গে পরিবেশকে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও উন্নত করার সে প্রবণতা, চিন্তা ও চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় তারই মধ্যে নিহিত থাকে তার সংস্কৃতি। ব্যক্তি জীবনে যেমন, সমষ্টির জীবনেও তেমনি, সংস্কৃতি চেতনা ও সংস্কৃতি আছে।"[২৭]

সংস্কৃতি বিষয়ক ধারণাসমূহে দেখা যায়, প্রতিটি মতামতের সাথে সংস্কৃতির একেকটি অঙ্গ-প্রতঙ্গের উপর বিশেষ পক্ষপাত রয়েছে যা কম বেশী সর্বত্রই দরকার। তাই এসব সংজ্ঞাকে মিলিয়ে নিলে দেখা যায় জীবন ও পরিবেশের উন্নতি বিধানের এবং ইচ্ছানুযায়ী ইতিহাসের গতি নির্ধারনের চিন্তা ও চেষ্টা-ই হয় সংস্কৃতি। বটবৃক্ষের স্বরূপের মতই সংস্কৃতির স্বরূপও বহুঅঙ্গে অঙ্গাঙ্গি এবং তা ব্যক্তি হতে সমষ্টি, সমষ্টি হতে জাতীয়, জাতীয় হতে আন্তর্জাতিকতার পথে ধাবমান।

Dhaka University Institutional Repository

২.সংস্কৃতি সম্পর্কে চিন্তকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মত

সংস্কৃতি সম্পর্কিত চিন্তাধারা অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, একই ভাবে এবং একই অর্থে ধারণাগুলোর বিস্তার ঘটেনি। দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য চিন্তার জগতে ও কর্মের জগতে নতুন ধারার জন্ম দিয়েছে। "ইংরেজী সাহিত্যে কালচার শব্দটা প্রথম আমদানী করেন ফ্রান্সিস্ বেকন ষোল শতকের শেষদিকে। উহাকে ডিফাইন করার চেষ্টা করেন সর্বপ্রথম ম্যাথু আর্নল্ড ইংলান্ড এবং ওয়াড্রু ইমর্সন আমেরিকায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি; কিন্তু কালচার শব্দের যে অর্থে উহার সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন শব্দটা বেশীদিন সে অর্থে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। বিশ শতকের মাঝামাঝি রবার্ট এযরা পার্ক ও টেইলার প্রভৃতি মার্কিন পন্ডিত এবং টার্নার ও লাস্কি প্রভৃতি ইংরাজ পন্ডিতগনের লেখায় কালচার শব্দটা অনেক ব্যাপক ও গভীর অর্থে ব্যবহৃত হইতে শুরু করে। এর ফলে শব্দটা নতুন তাৎপর্য গ্রহন করে। কিন্তু তাতে সমস্যা মিটে নাই। বরঞ্চ শব্দটা ব্যাপকতর ও গভীর অর্থে ব্যবহৃত হইতে শুরু করিয়াছে।"[২৮]

শোনা যায় " 'কালচার' বা সংস্কৃতির তথা কৃষ্টির একশো চৌষট্টিটি (Marrill:p.120) সংজ্ঞা বিশ্বময় চালু রয়েছে। বিস্ময়ের কথা কোনটাই সর্বতোভাবে বাতিল হয়নি, কেবল কেউ গ্রাহ্য কেউ অগ্রাহ্য করে মাত্র। কোনো কোনো সংজ্ঞার সমার্থক বেশী, কোনো কোনো সংজ্ঞার সমার্থক নগণ্য বা স্বল্প।"[২৯]

Culture কথাটার ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন সমাজ নৃতত্ত্ববিদ টাইলার। এর মধ্যে টাইলার তাঁর Primitive culture গ্রন্থে Culture এর সংজ্ঞায় বলেছেন, "...Culture is that complex whole includes knowledge, Belief , Art, Moral, Law, Custom and Other capabilities and habits acquired by man as a member of society."[৩০]

টাইলরের এ সংজ্ঞায় শেখার ব্যাপারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। "সমাজের একজন সদস্য হিসেবে শেখার ব্যাপারই সংস্কৃতির মূল।"[৩১] এবং শেখার উপর নির্ভর করেই সংস্কৃতি বিকশিত হয়। The new encyclopaedia Britannica য় বলা হয়েছে- "The development of culture depends upon human's capacity to learn and transmit knowlwdge to succeeding generations."[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

"উনবিংশ শতাব্দিতে বাঙালী সমাজের কিছু লোক ইংরেজদের সংস্পর্শে আসেন, ইংরেজি ভাষা শেখেন এবং ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হন। তারপর তারা ইংরেজী কালচার কথাটির সাথে পরিচিত হয়ে তার অনুসরণে বাংলায় সংস্কৃতির ধারনাটি উদ্ভাবন করেন।"[৩৩] "... বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী Culture শব্দের অনুসরণে বাংলায় 'অনুশীলন' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তৎকালে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, ভারতবর্ষের মানুষ ধর্মসাধনার মধ্যদিয়ে ভালো হওয়ার জন্য যে চেষ্টা করে, ইউরোপের মানুষ Culture এর সাধনা দ্বারা মোটামুটি তাই করে। কোনো কোনো দিক দিয়ে দু'য়ের মধ্যে পার্থক্যও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। এই অনুশীলন তত্ত্বকে আজকের ভাষায় সংস্কৃতিতত্ত্বও বলা যায়। অনুশীলন তত্ত্বের সারমর্ম বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় এরূপঃ

১."মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেই গুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২. তাহাই (অর্থাৎ মনুষ্যত্বই) মনুষ্যের ধর্ম।

৩. সেই অনুশীলনের সীমা ,পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য

৪. তাহাই সুখ।"[৩৪]

"বঙ্কিম অনেক পরে, বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে রবীন্দ্রনাথও 'কালচার' ব্যাপারটিকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। প্রথমে তিনি ব্যাপারটিকে বুঝবার জন্য 'চিত্তোৎকর্ষ' 'সমুৎকর্ষ' ইত্যাদি শব্দের কথা ভেবেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী কালচার অর্থে বৈদগ্ধ ব্যবহার করেছিলেন। কেউ কেউ কালচারের প্রতিশব্দ হিসেবে 'শিক্ষা'ও ব্যবহার করেছিলেন। তখন কালচার অর্থে বেশী প্রচলিত হয়েছিল 'কৃষ্টি'। হয়ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি শব্দটির প্রচলন ঘটিয়েছিলেন। 'কৃষ্টি' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ সহ্যই করতে পারতেন না, এর মূলে কর্ষনের ভাব থাকাতে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন কর্ষনের কথা মনে হলে চাষবাসের ও চাষাভূষার কথা তার মনে আসত। 'চিত্তোৎকর্ষ' ও 'সমুৎকর্ষ' ও তাঁর মনোপুত হয়নি একই কারণে। অনুশীলনের প্রতিও তাঁর মন আকৃষ্ট হয়নি। পন্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতি শব্দটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি শব্দটি আগ্রহের সঙ্গে গ্রহন করে নেন, এবং কালচার অর্থে শব্দটিকে তিনি বাংলা ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করেন। নীহাররঞ্জন রায় অবশ্য পরে দেখিয়েছেন

Dhaka University Institutional Repository

যে, সংস্কৃতি গ্রহন করার ফলে কৃষ্টি পরিত্যাগ করার কোনো মানে হয় না, কারণ ব্যুৎপত্তিগত দিক দিয়ে দুটি শব্দই একই অর্থ প্রকাশ করে। শব্দের এই যে পরিবর্তন অনুশীলন থেকে কৃষ্টি, কৃষ্টি থেকে সংস্কৃতি- এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভাবের ও চিন্তার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটেছে।"[৩৫]

রবীন্দ্রনাথ থেকেই সংস্কৃতির অন্তর্গত চেতনা অন্য দিকে সরে যেতে শুরু করেছে। নীহাররঞ্জন রায় শাব্দিক অর্থের তারতম্যের মধ্যে ঐক্য খুঁজে পেলেও রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন। "কৃষ্টির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে একাধিক যুক্তি উপস্থিত করেছেন তার ভিত শিথিল, পায়ের নিচে স্থিরভূমি নেই বললেই চলে।"[৩৬] তিনি আরও বলেছেন ,- "আসল কথা, কৃষ্টির প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরাগ তাঁর নিজস্ব সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। সে তত্ত্বের অন্যতম সূত্র হচ্ছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা, যা মানুষের জীবনধারনের প্রয়োজনের সীমার বাইরে, তার ভেতর থেকেই শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি। কৃষিকর্ম, চাষবাস একান্তই জীবনের স্থুল প্রয়োজন মেটাবার জন্য; সুতরাং সেই কর্ষণ ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত যে শব্দ কৃষ্টিতে তো শিল্পসাহিত্য অর্থাৎ মানুষের মনন কল্পনার শ্রেষ্ট সৃষ্টিকে বোঝাতে পারেনা। শিল্পসাহিত্য শাখা, উপশাখাগ্রের লতাশীর্ষের ফুল ফল, নিচেকার জমিতে যেখানে তাদের শেকড়ের চাষ ও বাস তার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ বহু দূরের, প্রায় অনাত্মীয়ের।"[৩৭] নীহাররঞ্জন রায় মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক যুক্তির বাইরেও জীবন ও জগতকেন্দ্রিক মানবিক যুক্তি উপস্থাপন করে বলেছেন:

"কৃষ্টির অর্থ যদি হয় কর্ষণক্রিয়া এবং তার ফলশ্রুতি, সংস্কৃতির অর্থ যদি হয় সংস্কার ক্রিয়া এবং তার ফলশ্রুতি এবং দুয়ের উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতিসাধন, তাহলে sub structure রচনা ও super-structure রচনাসংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মের আচার ব্যবহারের মধ্যে মূলগত পার্থক্য কিছু থাকতে পারে না। ঠিক একই যুক্তিতে super structure কে sub structure এর চেয়ে বা super-structure এর চেয়ে বেশী মূল্য দেওয়ার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। জীবনের পক্ষে দুই ই সমান মূল্যবান সমান অর্থবহ।"[৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন:

"রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতি বলতে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনের মতো তত ব্যাপক বৃহৎ গভীর ব্যাপার বুঝতেন না। তাঁর কাছে সংস্কৃতি কথার অর্থ অনেক সংকীর্ণ, সুক্ষ্ম। রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাপারটি বুঝাতে চাইতেন তার মর্মার্থ যদি আমরা অনুধাবন করি, তাহলে দেখব সংস্কৃতির অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে চিন্তা করতে চাইতেন না। মানুষের ভদ্র জীবনের সুন্দর জীবনের চেষ্টা জীবন যাত্রায় লাবণ্য ফোটাবার চেষ্টা , এই টুকুই তিনি বোঝাতে চাইতেন। মানুষের সকল কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক বোধের ও প্রয়াসের প্রকাশ ঘটে এবং সাংস্কৃতির পরিচয় ফুটে ওঠে- এই ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথ বলতে চাননি, অন্তত গুরুত্বের সঙ্গে বলতে চাননি। রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষের সংস্কৃতি চেতনার প্রকাশ ঘটে ও সংস্কৃতির পরিচয় বিধৃত থাকে তার সাহিত্য সৃষ্টির , কাব্য ও শিল্প সৃষ্টির প্রয়াসের মধ্যে, সুন্দর উচ্চারণে, পরিপাটি আয়োজনে, সঙ্গীত চিত্রকলা, নৃত্য ছন্দ ইত্যাদিতে। অর্থাৎ আজকাল সঙ্কীর্ণ অর্থে সংস্কৃতি চর্চা বলতে অনেকে যা বুঝে থাকেন। ঠিক সেই রকম না হলেও , সেই ধারারই ব্যাপার রবীন্দ্রনাথের দ্বারা হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্তদের কাছে ক্রমেই এর অর্থ সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর হয়ে পড়ে।"[৩৯]

নীহাররঞ্জন রায় sub-structure কে super-structure এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেননি। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন অর্থে ব্যবহৃত সংস্কৃতিকে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ বলে মনে করলেও ভারতীয় পরম্পরায় কুল ও শীল ধারনার মধ্যে সংস্কৃতির গভীরতা খুঁজে পেয়েছেন। ঐতরেয় ঋষির সূত্র ধরে তিনি বলতে চেয়েছেন মানবজীবনের সংস্কার সাধনোদ্দেশ্যে যে কোন কর্মই সংস্কৃতি কর্ম। আজকে যাকে আমরা শীল বলছি প্রজন্ম-পরম্পরায় তা কুল। কুল স্থির বা অতীত হয়ে গেলেও শীল কখনও স্থির হয়না। কুলকে সংস্কার করে যুগের প্রয়োজন মেটাতে হয়, এজন্য তিনি বলেছেন :

"ছন্দকে বাদ দিয়ে শিল্প হয়না , ছন্দহীন কর্মে আত্মসংস্কার হয় না। ছন্দহীন, আত্মসংস্কারহীন , সংস্কৃতি- কর্মবিহীন জীবন বন্ধ্যাজীবন। জীবনের বন্ধ্যাত্ব ঘোচাতে হলে ছন্দের নিয়ম অনুশাসন মানতেই হবে, বিরামহীন অনুশীলনের দ্বায়িত্ব স্বীকার করতেই হবে।"[৪০]

নীহাররঞ্জনের বক্তব্যের প্রকাশ ভঙ্গিতে ভিন্নতা থাকলেও বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্বই প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু তাই নয় , যে শিল্প, শিল্পী ও বিদগ্ধ রসিক সহৃদয় দর্শকশ্রোতার মধ্য দিয়ে আত্মসংস্কারের স্বার্থলেশহীন নৈব্যর্ক্তিক আনন্দে রূপায়িত হয় তার নিয়মশৃঙ্খলা , শিল্পীর জীবনাভিজ্ঞতা অল্প সময়ের জন্য হলেও দর্শকশ্রোতার অজান্তে চিত্তভূমির কর্ষণ ও সংস্কারক্রিয়া করে থাকে, তা ব্যক্তিত্বের স্থায়ী সম্পদ হয় না, তা তিনি স্বীকার করেছেন। তাই তিনি

Dhaka University Institutional Repository

'এথিক্স' (Ethics) ও 'ইসথিটিকস' (Aesthetics) এর পার্থক্য নির্ণয় করেছেন : "নীতিধর্ম পালনের ফলে মানুষ যে স্বার্থলেশহীনতার অধিকারী হয় সে অধিকার তার চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। তার ব্যক্তিত্বের স্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়। যা হারাবার ভয় থাকে না । কিন্তু শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি বা চর্চার ফলে মানুষ যে স্বার্থলেশহীন অভিজ্ঞতার নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ লাভ করে ,সে আনন্দ আপেক্ষিকার্থে ক্ষণস্থায়ী এবং সেইহেতু চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়না, পুরোপুরি স্থায়ী সম্পদ হয় না।"[৪১]

তার পরেও তিনি শিল্পসাহিত্যের নিছক আনন্দদানের মধ্যে নয়, আনন্দ ও মঙ্গলের উপযোগিতার মধ্যে যে নীতি ধর্ম আছে তার মধ্যে দিয়ে আত্মসংস্কার হয় বা ব্যক্তি ও সমষ্টির মানবিক উন্নতি হতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কিভাবে আত্মসংস্কার অর্থে সে সংস্কৃতি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করতে পারে তা দেখতে পারেননি বা শিল্পের উপযোগিতার মধ্যে শুধুমাত্র ব্যক্তির নিজের সংস্কারকেই দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু "বঙ্কিমচন্দ্র যে- অনুশীলনের কথা বলেছিলেন, তার অন্তর্ভুক্ত ছিল মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের প্রয়াস- শুধু ব্যক্তি মানুষ নয়, সামাজিক মানুষ, রাষ্ট্রীয় মানুষ, বৈশ্বিক মানুষ। অনুশীলনতত্ত্ব উদ্ভাবনে তাঁর অভীষ্ট ছিল ব্যক্তিকে পুনর্গঠিত করা, সমাজকে রাষ্ট্রকে জাতিকে পুনর্গঠিত করা, বিশ্ব ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করা।"[৪২]

গোপাল হালদার মার্কসীয় চিন্তধারা অবলম্বনে সংস্কৃতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কারণ সে সময় মার্কসীয় চিন্তাধারা দেশে প্রসার লাভ করেছে। তিনি বলেছেন, "মানুষ হিসেবে মানুষের আসল পরিচয়- ই তাহার সংস্কৃতি।"[৪৩] মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষ তার নিজের পরিচয়কে তুলে ধরবার প্রয়াস পায়। এজন্যই সংস্কৃতি রূপান্তরপ্রবণ। এই রূপান্তরকে তিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন:

"সংস্কৃতি বলতে তাই শুধু যে ঘরবাড়ি, ধনদৌলত, যানবাহন বুঝায় তাহাও নয়। শুধু যে রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান বুঝায় তাহাও নয়। সংস্কৃতি বলতে মানস সম্পদও বুঝায়- চিন্তা,কল্পনা, দর্শন, ধ্যান-ধারনা এইসবও বুঝায়-তাহাও আমরা জানি। বাস্তব ও মানসিক সমস্ত 'কৃতি' বা সৃষ্টি লইয়াই সংস্কৃতি- মানুষের জীবন সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টার এই নাম। এই জন্যই বৈজ্ঞানিক মতে সংস্কৃতির মোট তিন অবয়ব বা তিন প্রকারের অবলম্বন আছে, দেখতে পাই। প্রথমত-উহার মূল ভিত্তি সেই জীবন সংগ্রামের বাস্তব উপকরনসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

(Material means) ; দ্বিতীয়ত সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় সমাজ যাত্রার বাস্তব ব্যবস্থা (social structure) ; আর তৃতীয়ত সংস্কৃতির শেষ পরিচয় মানস সম্পদ। সেই মানস সম্পদ এই হিসেবে সমাজ সৌধের ' শিখরচূড়া' মাত্র (Super Structure), সহজ কথায় উপর তলার উপকরণ। তাহা হইলে সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি, কালচার জাতিগত, দেশগত বা ধর্মগত, তাহাও যেমন একটি অর্ধসত্য,তেমনি সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কালচার অর্থ কাব্য, গান, চারুকলা, বড়জোর দর্শন বা বিজ্ঞান পর্যন্ত, তাহাও তেমনি আরেকটি অর্ধসত্য। কথা এই যে, সংস্কৃতি সমাজ-দেহের শুধু লাবণ্য ছটা নয়, তাহার সমগ্র রূপ। তাই সমাজের পরিচয় দিয়াই সংস্কৃতির পরিচয়- এইটিই আসল কথা।"[৪৪]

"সংস্কৃতির অর্থ বঙ্কিমচন্দ্রের কালে যেমন ব্যাপক ও গভীর ছিল, তেমনি গোপাল হালদারের হাতে তা আবার ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করে। তবে বঙ্কিম থেকে ভিন্ন অর্থে। ...পরবর্তীকালে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর রচনাবলীতে, সংস্কৃতি কথা গ্রন্থে সংস্কৃতির একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা পাওয়া যায়। সেখানেও সংস্কৃতির ধারণা সংকীর্ণ নয়, ব্যাপক-গভীর।"[৪৫]

ব্যক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়ম মেনে সাধনা ও জীবধর্ম সৃষ্টি ধর্মানুযায়ী বা দেশকালগত ধর্মানুযায়ী সাধনার নানা বিচিত্র দিকের সীমাবদ্ধতা ও তার বিপরীত মুখী প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করে মোতাহের হোসেন চৌধুরী দেখিয়েছেন ব্যক্তির বিকাশে কিভাবে ধর্ম, সমাজ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ ব্যক্তির নিজস্ব মূল্যবোধের বা values এর বিকাশ ঘটাতে পারেনা। সামাজিক সমতা আনার জন্য সমাজ ও ধর্ম কাজ করে। "মোতাহের হোসেন চৌধুরী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে চিন্তা করেছেন, সমাজের দিকে দৃষ্টিকে বিশেষ প্রসারিত করেননি। ব্যক্তি যেহেতু সমাজের অংশ, সমাজ যেহেতু ব্যক্তি ছাড়া হয়না, সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজ দুটাই বিবেচ্য। পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় কখনও ব্যক্তির গুরুত্ব বেশী হতে পারে আবার কখনও সমাজের গুরুত্ব বেশী হতে পারে।"[৪৬] "মূল্যবোধ ব্যাপারটিকে তিনি সমাজ ব্যবস্থায়, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ও বিশ্ব ব্যবস্থায় বিস্তৃত করে দেখেননি। তাই তিনি আদর্শ ও আইনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টি দিয়ে তাকাননি।"[৪৭] এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিকে প্রভাবশালী গণ্য করেছেন সমাজের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে। সমাজ ব্যক্তির উপর প্রভাব ফেললে ব্যক্তির বিকাশ ব্যাহত হবে বলে তিনি সবসময় ব্যক্তিকে কালচারের অণুবিশ্ব ধরে নিয়েছেন। সমাজের রীতি-নীতি,ধর্ম,স্থূল প্রয়োজন ব্যক্তিকে মানিয়ে চলতে শেখায় বৈচিত্র্য নিয়ে, সৌন্দর্যবোধ নিয়ে,

Dhaka University Institutional Repository

নীতি,ধর্ম,স্থুল প্রয়োজন ব্যক্তিকে মানিয়ে চলতে শেখায় বৈচিত্র্য নিয়ে, সৌন্দর্যবোধ নিয়ে, মূল্যবোধ নিয়ে নিজের ভেতরের সূক্ষ্মচেতনার বিকাশ ঘটিয়ে বাঁচতে শেখায় না, এই যুক্তি তাঁর চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে। এ ব্যাপারটিতে বোঝাবার জন্য তাঁর একটি মন্তব্য তুলে ধরা যায়:

"সমাজতন্ত্র তার কাছে লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য। কালচার ব্যক্তিতান্ত্রিক এ কথা বললে এ বুঝায় না যে, কালচার্ড মানুষ সমাজের ধার ধারেনা, সে দলছাড়া,গোত্রছাড়া জীব তা নয়, সমাজের ধার সে খুবই ধারে। নইলে প্রাণ পাবে কোথেকে? ব্যক্তি তো নদী, সমাজ সমুদ্র"[৪৮]

উপরের একটি বাক্য -'সমাজের ধার সে খুবই ধারে'। তিনি স্পষ্ট করে কখনও বলেননি সমাজের কোন 'ধার' সে ধারে? কারণ তাঁর সংস্কৃতিমান ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে সমাজের রীতি, নীতি,ধর্ম, গতানুগতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে সম্পূর্ণ নিজের মত করে। হয়ত অন্ন বস্ত্রের মত স্থুল জৈবিক ভিত্তির ধার ব্যক্তি ধারে কিন্তু সেটি তাঁর কথায় পরিস্কারভাবে ধরা পড়েনি। যেমন তিনি বলেছেন, Man does not live by bread alone- এই কথাটার মধ্যেই ক্ষুৎপিপাসার স্বীকৃতি রয়েছে। তবে মর্যাদাভেদ আছে। যা নিয়ে বাঁচা যায় আর যার জন্য বাঁচতে হয়, তা কখনো এক মর্যাদা পেতে পারে না। তাই সংস্কৃতিকামীদের ইচ্ছা: "ক্ষুৎপিপাসার জগৎটি তৈরী করা হোক ক্ষুৎপিপাসার উর্ধে যে জগৎটি রয়েছে তার পানে লক্ষ্য রেখে। নইলে সংস্কৃতি ব্যাহত হবে।"[৪৯] তিনি আরো বলেছেন:

"সংক্ষেপে সুন্দর করে; কবিতার মতো করে বলতে গেলে, সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা; প্রকৃতি সংসার ও মানব সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শেকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা ; কাব্য পাঠের মারফতে, ফুলের ফোটায়, গল্পকাহিনীর মারফতে, নর-নারীর বিচিত্র-দুঃখে বাঁচা; ভ্রমন কাহিনীর মারাফতে,বিচিত্র দেশ ও বিচিত্র জাতির অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে বাঁচা; ইতিহাসের মারফতে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশে বাঁচা; জীবনকাহিনীর মারফতে দুঃখীজনের দুঃখ- নিবারণের অঙ্গীকারে বাঁচা। বাঁচা বাঁচা বাঁচা। প্রচুরভাবে গভীরভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা।"[৫০]

"এখানে যেভাবে বাঁচার কথা বলা হয়েছে সেভাবে বাঁচার জন্য মানুষকে সবসময় চেষ্টা করতে হয়, অর্থনৈতিক ,রাজনৈতিক, সামাজিক পারিবারিক ব্যক্তিগত সর্বাধিক কর্মে নিয়োজিত থেকে চেষ্টা করতে হয়। কোনো কর্তব্যকে অবহেলা করলে কিংবা এক রোখা একচোখা একগুঁয়ে হলে সুন্দর মহত গভীরভাবে জীবন-যাপন করা যায়না। মানুষের সংস্কৃতির পরিচয় তার কর্মের মধ্যে তা ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যে পর্যায়েই হোক। কর্ম না থাকলে সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

থাকে না। যে মানুষ প্রবৃত্তির দাস কিংবা অবস্থার দাস অথবা অভ্যাসের দাস, তার সংস্কৃতি সুস্থ নয়। বিকার প্রাপ্ত রুগ্ন।"[৫১]

আবুল মনসুর আহমদ দেশ, কাল, ধর্ম ও সমাজ সমষ্টি নিয়ে সংস্কৃতি চিন্তা করেছেন। মোতাহের হোসেন চৌধুরী যেখানে "ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার আর কালচার শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম। কালচার মানে উন্নততর জীবন সম্বন্ধে চেতনা- সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেমের সম্বন্ধে অবহিতি। সাধারণ লোকে ধর্মের মারফতেই তা পেয়ে থাকে। তাই তাদের ধর্ম থেকে বঞ্চিত করা আর কালচার থেকে বঞ্চিত করা এক কথা।"[৫২] বলে আলোচনা শুরু করে ধর্ম, ও ধার্মিকের চেতনা থেকে কালচার্ডকে পৃথক করেছিলেন এবং সূক্ষ্ম পার্থক্য করে শাস্তির ভয় ও পুরস্কারের লোভ থেকে দূরে অবস্থিত কালচার্ড মানুষের প্রেমের ঐশ্বর্যকে বোঝাবার জন্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়েছিলেন। সেই কালচার্ডের স্বরূপ তাঁর ভাষায় ছিলঃ- "সত্যকে ভালবাসা, সৌন্দর্যকে ভালবাসা ভালবাসাকে ভালবাসা বিনা লাভের আশায় ভালবাসা। নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালবাসা এরি নাম সংস্কৃতি।"[৫৩] সেখানে সমাজের কোন বিশেষ চাহিদা পুরণের লক্ষ্য বা রাজনৈতিক চেতনা প্রাধান্য পায়নি। এ সম্পর্কে অন্য একটি সূত্র অনুসন্ধান করা যায়:

"ব্রিটিশ শাসন কালের শেষ পর্যায়ে, স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে বাংলা ভাষায় জাতি ও জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ চেতনা ও চিন্তার সন্ধান মেলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতে দ্বি-জাতি তত্ত্ব কার্যকর হয়। দ্বি-জাতিতত্ত্ব অনুযায়ী বৃটিশ-শাসিত ভারতে দুই জাতির মানুষ বাস করে; হিন্দু জাতি ও মুসলমান জাতি। দুই ধারার রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও স্বার্থের সংঘাতের পরিণতিতে দ্বিজাতিতত্ত্ব দানা বাঁধে ও রূপ লাভ করে। দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তারা কথিত দুই জাতির জন্য ভারত বর্ষের ভূ-ভাগকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করে দুটি আলাদা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। প্রথমে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য চেতনা ও পরে দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারায় এয়াকুব আলী চৌধুরী, মওলানা আকরম খাঁ, আবুল মনসুর আহমেদ ও আরও কয়েকজনের চিন্তায় গভীরতা ও সূক্ষ্মতা লক্ষ্য করা যায়।"[৫৪]

সংস্কৃতি চিন্তায় মতের পথের পার্থক্য রয়েছে। কেউ ব্যক্তিতান্ত্রিক,কেউ সমাজতান্ত্রিক, কেউ ধর্মতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করেছেন। যার ফলে যুক্তিগুলোর গাঁথুনি কখনও মুক্তাভিসারী হতে

Dhaka University Institutional Repository

চেয়েছে কখনও বদ্ধ খাঁচায় আটকে পড়েছে। দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রসারতার অভাবে রক্ষণশীল ধারারও সূচনা হয়েছে।

৩. বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি

সংস্কৃতি বিষয়ক ধারণায় দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যগুলো থেকে জাতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি যেমন আছে, তেমনি সে জাতিগুলোর নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতিও আছে। কিন্তু "ইংরেজী ভাষায় Race ও Nation বলতে যেমন একটি জনসমষ্টির দু'ধরনের অস্তিত্ব বুঝবার সুযোগ রয়েছে। বাংলা ভাষায় তা নেই।"[৫৫] জাতি (Race) অর্থে আমরা বুঝি নৃতাত্ত্বিক বা সাংস্কৃতিক পরিচয়কে আর 'জাতি (nation) অর্থে বুঝি রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক পরিচয়কে। সুতরাং নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের যে বাঙালি জাতি, পৃথিবীর যে কোন দেশেই তার পরিচয় বাঙ্গালি, আর রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে যে বাঙালি জাতি তার পরিচয় হবে যে দেশে তার বসবাস তার নামানুসারে। যেমন বাংলাদেশের বাঙালিকে বাংলাদেশী বাঙালি, আর ভারতে বসবাসকারী বাঙালির পরিচয় হবে ভারতীয় বাঙালি। কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার বিভিন্ন জাতি (Race) মিলে রাজনৈতিক চেতনায় যখন ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তাকে বলা হয় জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদী চেতনার মূলে জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় চেতনা কার্যকর থাকে। জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকেই জাতিরাষ্ট্র (Nation state) গঠিত হয়। 'জাতীয় সংস্কৃতি' বলতে জাতি রাষ্ট্রের সম্মিলিত চেতনা বোধ ও স্বার্থে লালিত সংস্কৃতিকে বুঝায় । জাতীয়তাবাদের মধ্যে যেমন ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষার নানা উপাদান থাকে, জাতীয় সংস্কৃতিতেও তেমনি এসবের নানা উপাদানের সমন্বয় থাকে।

"বৃটিশ শাসনকালের শেষ পর্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে জাতি এবং জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা-চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃটিশ ভারতের রাজনীতিতে দ্বিজাতিতত্ত্ব কার্যকর হয়।"[৫৬] এই দ্বি-জাতি তত্ত্ব অনুযায়ী বৃটিশ ভারতের সংস্কৃতি বিভক্ত হয় দুই ধারায় ১) হিন্দু সংস্কৃতি ও ২) মুসলিম সংস্কৃতি। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয় দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। তখন নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ট জনসাধারনের ধর্মীয় পরিচয় ছিল মুসলমান। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক শোষকদের অর্থনৈতিক শোষন ও বাংলা ভাষা সংস্কৃতির উপর অনভিপ্রেত আক্রমণের ফলশ্রুতিতে যে সাংস্কৃতিক চেতনা শেষ পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ নেয় তা ছিল ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। যা নতুন করে গোটা বাঙালি জনগোষ্টিকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পাকিস্তান আমলে 'পাকিস্তানি সংস্কৃতি' চর্চার রক্ষণশীল ধারার মধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সংস্কৃতি যে রূপ নিয়েছে তা ব্যাখার প্রয়োজন আছে। "চব্বিশ বছর পর দেখা গেলো যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবীতে পাকিস্তানের সৃষ্টি, সেই জিনিসটিই আগা-গোড়া ভিত্তিহীন। বাংলাদেশের জনগণের মন মানস যে উপাদানে গঠিত হয়েছে তা হিন্দুর হোক, মুসলমানের হোক, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ এবং আদিবাসী যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন তাই-ই-আমাদের বাংলার সংস্কৃতি।"[৫৭] এবং তা বাংলাদেশের সংস্কৃতিও।

বাংলাদেশের এই সংস্কৃতি অন্যান্য বাংলা ভাষাভাষি বাঙালিদের থেকে স্বতন্ত্র। এই রূপ রেখাটি বিভাগ পুর্ব বাংলার অনেক কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও নিজস্ব। বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এখানে অন্য ধর্মের মানুষ বাস করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী যেমন গারো, চাকমা, হাজং, সাঁওতাল ইত্যাদি আদিবাসী রয়েছে। যাদের সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বাঙালিদের মতো নয়। "ইচ্ছে করলে ধর্মীয় পরিচয়, রাজনৈতিক পরিচয় বদল করা যায় কিন্তু 'সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক' পরিচয় বদল করা যায় না।"[৫৮] যে সকল জনগোষ্ঠী (Race) নিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডে যে জাতি (Nation) গড়ে উঠেছে তাদের সম্মলিত সংস্কৃতি হলো বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি (National Culture)। বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু ধর্মহীন নয়। বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি সামাজিক দিক থেকে স্থিতিশীল কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে অল্পবিস্তর বিতর্কিত। জাতীয় সংস্কৃতির নিয়ামক হল জাতীয় রাজনীতি। জাতীয় রাজনীতির ঐক্য, সংহতি ও স্থিতিশীলতা জাতীয় সংস্কৃতিকে করে সুসংহত। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে রাজনীতিতে জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় পরিচয় প্রশ্নে বুদ্ধিবৃত্তিক অনৈক্য দেখা দেয়। রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মেরুকরণের কবলে পড়ে জাতীয় সংস্কৃতির স্বরূপও অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে খণ্ডিত হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. বুদ্ধিজীবীর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

বাংলা ভাষায় 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটি ইংরেজী Intellectual শব্দের প্রতিশব্দ। তবে রাশিয়ায় উনিশ শতকের ষাটের দশকে intelligentsia -শব্দটি সমাজ ও রাষ্ট্রের বিশেষ সঙ্কটে যথার্থ দিক নির্দেশকারী একটি সম্প্রদায়ের লোকদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এই 'ইন্টেলিজেন্সিয়া'র বাংলা প্রতিশব্দ অনেকেই অনেকভাবে করেছেন। বিদ্বান, বিদ্বৎজন, বুদ্ধিজীবী, বিদ্বৎসমাজ ইত্যাদি প্রতিশব্দগুলো সম্পর্কে নানা মনীষীর নানা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ব্যবহার দেখলে বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সহজ নয়। কে বুদ্ধিজীবী আর কে 'বুদ্ধিজীবী' নয় তা নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা যায়। তবে এখানে শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীর পরিচয় দেবার চেষ্টা করব যা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্ভর।

"সব মানুষই বুদ্ধিজীবী; কিন্তু তাই বলে সমাজে সব মানুষকে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করতে হয় না"[৫৯]। গ্রামসির এ সংজ্ঞায় ভূমিকা পালনের সাথে সামাজিক দ্বন্দ্বের বিষয়টি ধরা পড়েছে। যাঁরা ভূমিকা পালন করেন তাঁদেরকে তিনি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এক. ঐতিহ্যগত বা প্রথাগত বুদ্ধিজীবী, দুই. জৈবিক বা সাংগঠনিক বুদ্ধিজীবী। এই উভয় ধরণের বুদ্ধিজীবীরাই কোন না কোনভাবে 'শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব' করে এবং সমাজকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালায়। "গ্রামসি ইতালীয় প্রেক্ষিত থেকে দেখান যে, প্রথাগত বুদ্ধিজীবীরা প্রধানত গ্রামাঞ্চল বা মফস্বল শহরে উদ্ভূত। আর সাংগঠনিক বুদ্ধিজীবীরা শিল্পায়িত বড় বড় শহর এলাকার অধিবাসী।"[৬০] তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, ঐতিহ্যগত বুদ্ধিজীবীরা হলেন- শিক্ষক, যাজক, পুরোহিত, মোল্লা প্রশাসক আর সাংগঠনিক বুদ্ধিজীবীরা হলেন পুঁজিপতি, শিল্প প্রযুক্তিবিদ, রাজনীতি-অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি।

ফরাসি পন্ডিত "জুলিয়ান বেন্দা বুদ্ধিজীবী বলতে মহৎ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, ঐশ্বরিক প্রতিভাধর, মানবাধিকারের জন্য নিবেদিত খুবই সংখ্যাল্প সদস্যের এক অভিজাত শ্রেণীকে নির্দেশ করেন; তার বিবেচনায় সক্রেটিস, যিশুখ্রিস্ট, ভলতেয়ার প্রমুখ বুদ্ধিজীবীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জুলিয়ান বেন্দার বুদ্ধিজীবী এক মহৎ মানুষ। মানবতার মঙ্গল তার আরাধ্য।"[৬১] পরবর্তীকালে বুদ্ধিজীবী ধারণাটির ব্যবহারিক পরিচয় নির্দেশ করেছেন– আরও কয়েকজন। প্রবীণদের মধ্যে মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক সি. রাইট মিলস (মিলস, ১৯৬৩:২৯৯), এডওয়ার্ড

Dhaka University Institutional Repository

মিলস (মিলস, ১৯৫৮:২) এবং পরে মিশেল ফুকো, এডওয়ার্ড সাঈদ, নোয়াম চমস্কি প্রমুখের মতো গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিজীবী।"[৬২]

এঁদের চিন্তাধারায় বুদ্ধিজীবীদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হলো বুদ্ধিজীবীরা সকল মানুষের সমানাধিকারের জন্য, মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ন্যায়-বিচার, নিরাপত্তা বিধানের সহায়ক কোন বক্তব্য, মতামত, দর্শন বা সাহিত্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। এর জন্য তাঁরা কোন নির্দিষ্ট জাতি-ধর্ম বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না। এঁদের মধ্যে এ্যডওয়ার্ড সাঈদ এ বুদ্ধিজীবীদের যে পরিচয় দিয়েছেন তা সমকালীন পটভূমিতে সুবিন্যস্ত। ১৯৯৩ সালে সাঈদ যে 'রিথ বক্তৃতা' দেন তখন তিনি who are intellectuals? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে নোয়াম চমস্কি, এন্টেনিও গ্রামসি, মিশেল ফুকো, পিটার নোভিক, রাসেল জ্যাকোবাই, জ্যাঁ পল সার্ত্র, জাঁ জেঁনে প্রমুখ চিন্তাবিদদের সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর মতে, "বুদ্ধিজীবী সেই মহৎ বৈশিষ্ট্য বা গুণের অধিকারী যার তাড়নায় তিনি জনসমাজের জন্য এবং জনসমাজে কোন বক্তব্য, মনোভাব, দর্শন বা মতামত রূপায়িত করেন, উচ্চারণ করেন এবং তার প্রতিনিধিত্ব করেন।"[৬৩]

বাংলা ভাষায় বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলায় বিদ্বৎসমাজ' গ্রন্থে 'বুদ্ধিজীবী'র পরিচয় অন্বেষণ করেছেন। "উত্তর খুঁজতে তিনি ম্যাক্সওয়েবার, আর্নল্ড টয়েনবি, কার্ল ম্যানহেইম, রবার্ট মিচেলস প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী ও পন্ডিতের ওপর দারুনভাবে নির্ভর করেছেন।"[৬৪] তিনি তৎকালীন কলকাতা কেন্দ্রিক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি (হিন্দু-মুসলিম) মধ্যবিত্ত সমাজকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি যে বুদ্ধিজীবীর পরিচয় দিয়েছেন তারা শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষার সাথে তাঁদের সম্পর্ক রয়েছে। Intellectual-এর বাংলা তিনি বিদ্বৎজন করেছেন। যে শিক্ষার কথা তিনি বলেছেন সে সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হলো- "বিদ্বান হলেই বিদ্বৎসমাজভুক্ত হয়না। পাঠশালা পর্যন্ত পড়েছেন এরকম self educated কোন সাহিত্যিক অনেক শিক্ষিত চিন্তালস অ্যাকাডেমিসিয়ানের চেয়ে দেশের বিদ্বৎসমাজের মধ্যে অগ্রগণ্য প্রভাবশালী ব্যক্তি হতে পারেন। শিক্ষিত আর বিদ্বৎজন এক নন।"[৬৫]

কার্ল ম্যানহাইমের উদ্ধৃতি তুলে ধরে তিনি যা বলেছেন তা হলো–" In every society there are social group whose special task it is to provide an

Dhaka University Institutional Repository

interpretation of the world for that society. We call these the 'intelligentsia. প্রত্যেক সমাজে নানা গোষ্ঠীভুক্ত এমন কিছু লোক থাকেন, যাঁদের কাজ হল সেই সমাজের জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করা এবং ব্যাখ্যা করা। যাঁরা সমাজের এই জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করেন, তাঁরাই বিদ্বৎসমাজের অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য। তাঁরাই প্রকৃত বিদ্বৎজন।"[৬৬] তিনি শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করেননি তবে শিক্ষার সাথে বিদ্বৎজন বা বুদ্ধিজীবীর সামাজিক ভূমিকার যোগসূত্র স্থাপন করে বলেছিলেন– "বিদ্যার ভুড়ুভুড়ি' বলে একটা কথা আছে আমাদের দেশে। মহাবিদ্বান কেউ যদি অগাধ জ্ঞান সমুদ্রে ডুব দিয়ে তলিয়ে থাকেন এবং কেবল ভুড়ুভুড়ি কাটেন, যদি তাঁকে দেখা না যায়, তার চিন্তা ভাবনার কথা জানানো যায়, তাহলে তিনি জ্ঞানতপস্বী 'স্কলার' হলেও, সামাজিক অর্থে 'ইন্টেলেকচুয়াল' নন।"[৬৭]

শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত, self educated যা-ই হোকনা কেন বুদ্ধিজীবী অবশ্যই শিক্ষিত হবেন এ কথাটি অস্বীকার করবার উপায় নেই। এখন আরেকটি প্রশ্ন হল বুদ্ধিজীবী পরিচয়ের সাথে জীবিকার কোন দ্বন্দ্ব বা সম্পর্ক আছে কিনা? জার্মান অভিধানে, বুদ্ধিজীবীকে 'মেধা শ্রমিক' বলা হয়েছে। যা পেশার সাথে সম্পর্কিত। "কিন্তু তিনি যে পেশা বা কর্মের-ই হননা কেন তাঁর কর্মে যদি 'চিন্তা, সজীব পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা, সৃষ্টিশীল অভিনবত্ব, মৌলিক সমালোচনা না থাকে তবে তাকে বুদ্ধিজীবী বলা যায় না।"[৬৮] তাহলে বোঝা যায় যে, বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত ও পেশাজীবী উভয়ই হতে পারেন আবার শিক্ষিত হলেও পেশাজীবী নাও হতে পারেন। এটা মূল পরিচয় নয়, তার প্রকৃত পরিচয় তিনি সমাজের অন্য মানুষের তুলনায় কতটা দায়িত্বশীল তাঁর চেতনায়। "তিনিই বুদ্ধিজীবী যিনি মানুষ, সমাজ, প্রকৃতি এবং বিশ্বব্রহ্মান্ডের চিন্তায়, সমাজের অন্তর্গত অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় অধিক মাত্রায়, সাধারণভাবে প্রযোজ্য ও বিমূর্ত সংকেতবাহী প্রতীক ব্যবহার করেন।"[৬৯] অর্থাৎ মানুষ কোন না কোন কর্মে যুক্ত থেকে শুধুমাত্র বুদ্ধির প্রয়োগ করলেই তাকে বুদ্ধিজীবী বলা যায় না। "নির্দিষ্ট ছকে বুদ্ধির প্রয়োগ যেমন কোন মানুষকে বুদ্ধিজীবী বানায় না, তেমনি বুদ্ধিজীবী রূপে সক্রিয় হওয়ার পথে কোন অন্তরায়ও সৃষ্টি করেনা।"[৭০] এজন্য তাঁর এমন 'মানসভঙ্গি' দরকার যা মানুষের সমস্যা সমাধানের চিন্তায় উদ্বিগ্ন রাখে। সমাজের মানুষের সমস্যা ও সমাধানের প্রশ্নে বুদ্ধিজীবীর বিবেকের ভূমিকাটি বেশি প্রাসঙ্গিক। বিবেকের ভূমিকায় একজন বুদ্ধিজীবী সমাজে নিযুক্ত পেশাজীবীর চেয়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এই অতিরিক্ত ভূমিকাটিই তাঁর স্বতন্ত্র পরিচয়-জ্ঞাপক।

Dhaka University Institutional Repository

বিবেকী দায়িত্ব পালনে তাঁকে যোদ্ধার ভূমিকায় অগ্রসর হতে হয়। তাঁর অস্ত্র মূলত ভাষা। তাঁর শানিত জ্ঞান ও বুদ্ধি সবসময় জাগ্রত থাকে। তাঁর উপলব্ধিগত ন্যায়বোধ, কল্যাণবোধ দিয়ে তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন। এবং যে কোন কর্তৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করবেন। তিনি লোভমুক্ত হবেন। লোকভয়, লোকনিন্দা দৈহিক নিগ্রহ বরণ করতে হলেও যিনি কোন কর্তৃত্বের ইচ্ছার কাছে পরাজয় স্বীকার করবেন না। উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় অনুসন্ধান জরুরী।

বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীর পরিচয় পাওয়া যায় কিছু ব্যবহৃত বিশেষণ থেকে। "...বুদ্ধিজীবীদের মহিমান্বিত করা হয় জ্ঞানী, জ্ঞানানুরাগী, জ্ঞানসাধক, বিবেকবান, সন্ধিৎসু যুক্তিবাদী, আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, স্রষ্ঠা, মানবপ্রেমিক মনুষ্যত্বসাধক, মহৎপ্রাণ, ন্যায়-সত্য-সুন্দরের পুঁজারী, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, জাতির বিবেক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ভাবুক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী 'Cream of society' ইত্যাদি বলে।"[৭১] এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বুদ্ধিজীবীরা "কোন বাহ্য প্রয়োজনের লোভে নয়, অন্তরের তাগিদে সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং নিজেদের অনুশীলনজাত অগ্রসর চিন্তা, উপলব্ধি ও অনুভূতি জনগণের মধ্যে সংক্রমিত করে দিয়ে জনগণের চেতনাকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেন।"[৭২] জনগণের চেতনাকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করতে গিয়ে তারা 'জীবন সমাজ সংস্কৃতি' ও আর্থ-রাজনৈতিক জীবন' সম্পর্কে সচেতন থাকেন। প্রয়োজনে এই বৈশিষ্ট্যের বুদ্ধিজীবীরা 'প্রয়োজনমত কথা' বলতে প্রস্তুত থাকেন।[৭৩]

একথা সত্য যে, সামাজিক ভূমিকা পালন করতে গিয়ে খুব অল্প সংখ্যক বুদ্ধিজীবীই নিজের বিশ্বাস আদর্শে ও ত্যাগ সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত অবিচল থাকতে পারেন। পারেন না বলেই সমাজের বিভিন্ন অংশে তাঁদের সম্পর্কে সন্দেহ, অবিশ্বাস জন্ম নেয়। এই অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা থেকে তাঁদের সম্পর্কে যে বিশেষণগুলো ব্যবহৃত হয় তা কোন বুদ্ধিজীবীকে আর বুদ্ধিজীবীর সম্মানযোগ্য আসনে রাখেনা। স্খলিত বুদ্ধিজীবীর পরিচয় ও সমাজে বিরল নয়। যাদেরকে "অভিহিত করা হয় সুবিধাবাদী, লোভী, হীন স্বার্থান্বেষী, বঞ্চক, প্রতারক শাসক-শোষকদের দালাল, আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল, আত্মবিকৃত, জ্ঞানপাপী, বিদ্যা-ব্যবসায়ী, 'racketeer' ইত্যাদি বলে।"[৭৪]

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধিজীবীর পরিচয়সূচক বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে বোঝা যায়, সামাজিক ভূমিকার প্রশ্নে সবসময় তাঁরা ইতিবাচক নয়। নেতিবাচকও হয়ে থাকেন। দায়িত্বহীনতা বুদ্ধিজীবীকে মানসিক মৃত্যুর পথে ধাবিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

০১. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনাবলী*, সৈয়দ আবুল মকসুদ সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫,পৃ.০৫।

০২. খোন্দকার সিরাজুল হক, 'মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম', *সংস্কৃতিসাধক মোতাহের হোসেন চৌধুরী*, সম্পাদক মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, কথা প্রকাশ ২০০৭,পৃ.১৪৩।

০৩. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *সংস্কৃতির সহজ কথা*, এ্যাডর্ণ পাবলিকেশন,২০০২, পৃ. ১৭।

০৪. *বঙ্কিম রচনাবলী*, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬১,পৃ.৫৩১।

০৫. আবুল কাসেম ফজলুল হক,পূর্বোক্ত, পৃ.১৮।

০৬. নীহাররঞ্জন রায়, 'কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি' *ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা*,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ.১০১।

০৭. অতুলচন্দ্র গুপ্ত,'মানুষ ও সংস্কৃতি', *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা*, সংকলন ও সম্পাদনা আবুল কাসেম ফজলুল হক ও মিজান রহমান, কথা প্রকাশ,২০০৯, পৃ.৩৭।

০৮. কাজী আবদুল ওদুদ, 'সংস্কৃতির কথা', *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৭।

০৯. অন্নদাশঙ্কর রায়, 'সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ', *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৮।

১০. কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, 'গণসঙ্গীতচর্চা', আগামী প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ৬৫।

১১. গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, মুক্তধারা, ১৯৭৪ পৃঃ ৩৮

১২. ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, 'বাঙালি সংস্কৃতি', *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা*,পূর্বোক্ত, পৃ.২৮৯।

১৩. *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী*, মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম সম্পাদিত, তৃতীয় খণ্ড,১৯৯৩, ঢাকা, পৃ. ৪৫৬-৪৫৭।

১৪. *মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী*, 'ধর্ম ও সংস্কৃতি', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সংগৃহীত, সংকলিত ও সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, ১৯৮২,ঢাকা। পৃ. ৮২।

১৫. পূর্বোক্ত।

১৬. ফরাসী বিজ্ঞানী ও দার্শনিক পাসকালের উক্তি, উদ্ধৃত আনিসুজ্জামান, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, 'সাংস্কৃতিক বহুত্ব',অন্যপ্রকাশ,ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩১।

১৭. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী , *স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি*, 'ভূমিকা অংশ', ডানা প্রকাশনী,১৯৮৩,পৃ.৭।

১৮. *আবুল কালাম শামসুদ্দিন রচনাবলী* ,প্রথম খণ্ড, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪,পৃ. ১৪৮।

১৯. পূর্বোক্ত পৃ. ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

২০. আহমদ শরীফ, *সংস্কৃতি ভাবনা*, 'সংস্কৃতির মুকুরে আমরা', উত্তরণ, ২০০৪, পৃ ৬৮।

২১. আহমদ শরীফ,পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।

২২. আবুল ফজল, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, মাহবুবুল হক সম্পাদিত, 'সংস্কৃতি', সময় প্রকাশন, ২০০১, পৃ. ১১৪।

২৩. আবুল ফজল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬।

২৪. আবদুল মতীন, সংস্কৃতির সন্ধানে, *লোকায়ত*, দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা,নভেম্বর ১৯৯৩।

২৫. আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৬, পৃ. ১৮।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

২৭. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *সংস্কৃতির সহজ কথা*, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০২ পৃ. ২৬।

২৮. আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার*, পূর্বোক্ত, পৃ.৯।

২৯. আহমদ শরীফ,পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ.২৮।

৩১. বুলবন ওসমান, *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব*, দিব্যপ্রকাশ, ২০০১, পৃ.১৪।

৩২. Volume 3,1768 15th Edition P.G. 784.

৩৩. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *সাহিত্য চিন্তা*, গেন্নাব লাইব্রেরী, ২০০৩, পৃ.২৭।

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ.৩০,৩১।

৩৫. আবুল কাসেম ফজলুল হক,*আশা আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩; পৃ.২৭৯।

৩৬. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ.৯১।

৩৭. পূর্বোক্ত।

৩৮. পূর্বোক্ত পৃ.১০৫।

৩৯. আবুল কাসেম ফজলুল হক, পূর্বোক্ত,পৃ.২৭৯,২৮০।

৪০. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ.১০৫।

৪১. পূর্বোক্ত,পৃ.১১৬,১১৭।

৪২. আবুল কাসেম ফজলুল হক, পূর্বোক্ত,পৃ.২৭৮,২৭৯।

৪৩. গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, মুক্তধারা, ১৯৯৬,পৃ.৩৯।

৪৪. পূর্বোক্ত,পৃ.৪৯

৪৫. আবুল কাসেম ফজলুল হক, পূর্বোক্ত,পৃ.২৮০।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *সংস্কৃতির সহজ কথা*, পূর্বোক্ত,পৃ.২০।

৪৭. আবুল কাসেম ফজলুল হক, 'মোতাহের হোসেন চৌধুরীর চিন্তা জগৎ', *সংস্কৃতি সাধক মোতাহের হোসেন চৌধুরী*,পূর্বোক্ত, পৃ.১২১।

৪৮. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ.৫,৬।

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ.১৪,

৫০. পূর্বোক্ত পৃ.১৬।

৫১. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *সংস্কৃতির সহজ কথা*, পূর্বোক্ত,পৃ.২১।

৫২. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ.৫

৫৩. পূর্বোক্ত পৃ.৬।

৫৪. আবুল কাসেম ফজলুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০।

৫৫. ডাঃ এস,এম, লুৎফর রহমান, *বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ*, আহমেদ মুসা সম্পাদিত'জাতি, জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ, দিব্যপ্রকাশ, ২০০১,পৃ.১১৫।

৫৬. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *আশা আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে*,পূর্বোক্ত, পৃ.৩০।

৫৭. *আহমদ ছফা,রচনাবলী* ২, 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' সন্দেশ, ২০০১, পৃঃ ২৪১।

৫৮. মনসুর মুসা, 'বাঙালি-বাংলাদেশী বিতর্ক', *বাঙালির চিন্তাধারা*, মিজান রহমান সম্পাদিত, জাগৃতি প্রকাশনী,২০০৫, পৃ.৭০।

৫৯. আনতোনিও গ্রামশি, *বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা*, সম্পাদনা ও অনুবাদ সৌরীন ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্ল পাবলিশার্স, ২০০১, পৃ.৮

৬০. ফয়েজ আলম, *বুদ্ধিজীবীর দায়ভার*, সম্পাদনা রিসি দলাই 'বুদ্ধিজীবী ও তার দায়ভার',সংবেদ প্রকাশনা ২১, ২০০৯, পৃ.১৯।

৬১. পূর্বোক্ত পৃ. ১৯।

৬২. পূর্বোক্ত পৃ. ২০।

৬৩. পূর্বোক্ত পৃ. ২০।

৬৪. শহিদুল ইসলাম, 'কে বুদ্ধিজীবী', *বুদ্ধিজীবীর দায়ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫।

৬৫. বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, ২০০০,পৃ.৮

৬৬. পূর্বোক্ত

৬৭. পূর্বোক্ত।

৬৮. অধ্যাপক হফস্টাটার, Anti intellectualism in American Life (1964), উদ্ধৃত অরবিন্দ পোদ্দার, আধুনিক বুদ্ধিজীবী ও সংগ্রামী চেতনা, গ্রন্থ বিতান, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ.১০

Dhaka University Institutional Repository

৬৯. এডওয়ার্ড শীলস, উদ্ধৃত অরবিন্দ পোদ্দার, *আধুনিক বুদ্ধিজীবী ও সংগ্রামী চেতনা*, পূর্বোক্ত, পৃ.২

৭০. অরবিন্দ পোদ্দার, পূর্বোক্ত, পৃ.১০

৭১. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৮,১৫৯।

৭২। পূর্বোক্ত, পৃ.৩২।

৭৩। *অধ্যাপক আহমদ শরীফ সাক্ষাৎকারে সমকাল*, অনন্যা, ২০০২, পৃ.১৯৩।

৭৪। আবুল কাসেম ফজলুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক ও প্রযুক্তিগত প্রভাব

পাকিস্তান আমলে সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিচিন্তা একটি বৈষম্যমূলক আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার ছিল। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার অন্তরালে ছিল অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে বাঙালি জাতিকে দুর্বল করার হীন প্রচেষ্টা। কিন্তু ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত ঘটে। এই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ প্রকৃতপক্ষে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তির চেতনা। এই চেতনার বাস্তবায়ন ঘটাতে রাজনীতি ও সংস্কৃতি একই প্লাটফর্মে হাত ধরা ধরি করে এগিয়ে চলে। ১৯৫৪ এর যুক্তফন্টের বিজয়, ১৯৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন,১৯৬৬ এর ছয় দফা আন্দোলন,১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ এর নির্বাচন একই লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিক বিজয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় নিশ্চিত করেছিল ১৯৬৬ এর ছয়দফা আন্দোলন। ছয়দফা আন্দোলন ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদের মূল স্পিরিট যাতে ছিল শক্তিশালী অর্থনীতি নির্মাণের অঙ্গিকার। সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোও রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে এগিয়ে গেছে। সংস্কৃতি রাজনীতিকে করেছে প্রভাবিত।

পাকিস্তানী শাসনামলে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সম্মেলনগুলো হয়েছিল তার মধ্য দিয়ে দায়বদ্ধ শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা পালন করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সামরিক শাসক আইয়ুব খান শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতা রাজনৈতিকভাবে হরণ করলেও সাংস্কৃতিকভাবে তাদের স্বাধীনতা হরণ করতে কখনও সক্ষম হননি। সাংস্কৃতিক সেই শক্তিই পরিণতি পেয়েছিল ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। রাজনীতির গতি নির্ধারনে সংস্কৃতি সহায়ক না হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। রাজনৈতিক দল ও দলের নেতারা সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

বিমুখ হয়ে ক্ষমতা ও ভোটে জেতার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত আছে আর সংস্কৃতিও কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের চিত্তবিনোদনের উপায় হিসেবে দেখা দিয়েছে।

তাই সংস্কৃতির ক্ষেত্র যেমন সীমিত হতে থাকল রাজনীতিও তেমনি সীমিত হতে হতে ক্ষমতা দখলের অস্ত্র হয়ে উঠল। স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনীতির ভেতরে সাংস্কৃতিক উদাসীনতার সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্তনের মূলসূত্র অর্থাৎ যে মৌলিক সম্পর্কগুলো তার ও স্বাভাবিক পরিবর্তন বিঘ্নিত হয়েছে। মৌলিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে মূলত আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু Sub-structure এর সাথে super-structure এর সমন্বয় না হওয়ায় বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে গত তিন দশকে কোন আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। এজন্য রাজনীতিকেই প্রধানত দায়ী করা যায়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্গতির কারণে জাতীয় উন্নতির বিরাট বিরাট সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংস্কৃতির যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তা সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়। গণতান্ত্রিক চর্চাও বিকশিত হয়নি। ১৯৭২ সাল থেকে প্রতিটি সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এরই মধ্যে জরুরী অবস্থা জারি হয়েছে, বারবার সামরিক শাসন এসেছে। রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ও সংকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নেতৃত্বের এই দুর্গতির জন্য আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনও কাঙ্খিতভাবে হচ্ছেনা। প্রযুক্তির বিকাশও সবসময় ইতিবাচক হয়নি। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নানাভাবে জাতীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করে চলেছে। গত তিন দশক ধরে বাংলাদেশের এই অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মূল আলোচনাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে নিয়েছি।

ক) রাজনীতিতে সংস্কৃতি

খ) আর্থ-সামাজিক অবস্থা

গ) প্রযুক্তির বিকাশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির রূপান্তর ।

ক) রাজনীতিতে সংস্কৃতি

বাংলাদেশের তিন দশকের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতা মূলত শাসন কাল নির্ভর। গত প্রায় তিন দশকে রাজনীতির পালাবদলের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সাংস্কৃতিক পরিসরে বিবেচনার জন্য শাসনকাল অনুযায়ী আমরা ভাগ করে নিতে পারি:

Dhaka University Institutional Repository

১) শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল (১৯৭২-১৯৭৫)

২) জিয়াউর রহমানের শাসনকাল (১৯৭৭-১৯৮১)

৩) এরশাদের শাসনকাল (১৯৮২-১৯৯০)

ও

৪) খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার শাসনকাল (১৯৯১-২০০০)

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল

"দীর্ঘ নয় মাসের কারাবাসের পর শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ব্রিটেনের রাজকীয় বিমান বাহিনীর বিশেষ বিমানে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী নয়াদিল্লী পৌছেন। ঐ দিন অপরাহ্নে ঢাকা পৌছেই 'সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে অপেক্ষমান লক্ষ লক্ষ মানুষের জনসভায় 'গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য' রাখেন"[১]। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শেখ মুজিব ছিলেন রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ১১ জানুয়ারী সকালে শেখ মুজিবর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমদ সরকার পরিচালনার বিষয়ে একান্ত বৈঠক করেন এবং "রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে মূল দায়িত্ব শেখ মুজিবের কাছে হস্তান্তর করার বিষয়টি স্বল্প আলোচনার মাধ্যমেই স্থির হয়"[২] । 'বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারির মধ্য দিয়ে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং শেখ মুজিবর রহমান প্রধানমন্ত্রী পদে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। "এই অস্থায়ী সংবিধান আদেশে রাষ্ট্রপতি পরিবর্তন, মন্ত্রিসভা নিয়োগ, শপথ, হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে সদ্য স্বাধীন দেশটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিধিসম্মতভাবে অগ্রসর হতে প্রয়াসী হয়"[৩]। এক বছরের কম সময়ে সংবিধান প্রস্তুত করা ছিল এই শাসনামলের অসামান্য অবদানের একটি। গণপরিষদের সর্বাত্মক চেষ্টায় ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান গৃহিত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর কার্যকর হয়। সংবিধানের চারটি মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরেপক্ষতাবাদ গৃহীত হয় এবং সংবিধান কার্যকর হওয়ার তিন মাসের মধ্যে (১৯৭৩ সাল ৭ মার্চ) বাংলাদেশের প্রথম সাধারন নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয় যা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের সহায়ক ছিল। শুধু তাই নয়, তিন মাসের মধ্যে (১৯৭২, ১২ মার্চ) ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার করানো হয়। ১৭ মার্চ ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে আসলে সে সময় ২৫ বছর মেয়াদী "বাংলাদেশ ভারত বন্ধুত্ব, শান্তি ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়"[৪] । জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ, বাংলাদেশের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে দেয়। বিশ্বব্যাংক, আন্ত র্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) জাতিসংঘ, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইত্যাদিতে সদস্যপদ লাভ করায় নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যাত্রা পথে হতাশা অনেকটা লাঘব হয়। সে সময় আদর্শ ও মতাদর্শগত কারণে পৃথিবীর রাজনৈতিক সমাজ দুটি বলয়কে বিভক্ত ছিল। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক বলয়কে অবস্থান নিয়েছিল। ভারত, রাশিয়া

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়াও পৃথিবীর অনেক দেশ সে সময় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির কারণে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সাথে শেখ মুজিব সরকারের ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু "পাশাপাশি ইসলামী বিশ্ব ও পশ্চিমা শক্তির সাথেও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ ও পাকিস্তানের শর্তহীন স্বীকৃতি আসে ১৯৭৪ সালে"[৫]।

মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক দলের সদস্যের সমন্বয়ে 'জাতীয় সরকার' গঠনের প্রত্যাশা ছিল স্বাভাবিক কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় সরকার গঠনের প্রত্যাশিত প্রস্তাবমত সরকার গঠন না করে জাতিকে প্রথমেই বিভক্ত করে ফেলেন। আওয়ামী লীগের বাইরে অন্যান্য দলের সদস্যরা তাই কেন্দ্রীয় শক্তির বাইরে চলে যায়। যে আওয়ামী লীগকে নিয়ে তিনি সরকার গঠন করলেন, সে দলও সুসংগঠিত কোন দল ছিলনা। সাংগঠনিক দিক দিয়ে দুর্বল ছিল। "গণতন্ত্রের উপলব্ধি অনুশীলন না থাকায় শুধুমাত্র গণতন্ত্রের স্লোগান ছিল ফলে দলের ভেতরে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু মীমাংসা হয়নি"[৬]। এই অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব নিয়েই তাজউদ্দিন আহমদ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে প্রবাসী সরকারের কার্যক্রম চালিয়ে নিয়েছিলেন। নানা ষড়যন্ত্রকে তিনি প্রতিহত করেছিলেন। শেখ মুজিবর রহমান, তাজউদ্দিনের কাছে সে অভিজ্ঞতার কথা কখনই জানতে চাননি বরং উপেক্ষাই করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাশূন্য শেখ মুজিব ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হতে থাকেন মুজিবনগর সরকারের যুদ্ধকালীন সময়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে। এ কথা সত্য যে, স্বাধীনতার পর মুজিবনগর রাজনীতির প্রতিচ্ছবি দারুন ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মুজিব নগরের দ্বন্দ্ব যুদ্ধকালীন সময়ে কোন সঠিক পথ না পেলেও স্বাধীনতার পর সুযোগ খুঁজে পেয়েছে। কারণ শেখ মুজিবের উপর শেখ মনির প্রভাব ছিল অপরিসীম। রাজনৈতিক চিন্তাধারার চেয়ে ব্যক্তিগত সর্ম্পক বড় হয়ে উঠেছে শেখ মুজিবের কাছে। যুদ্ধোত্তর দেশের পুর্নগঠনে শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন কে কাজে লাগাতে সক্ষম হননি। তাছাড়া "শেখ মুজিবের সংগে তাজউদ্দিনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল"[৭]। তাজউদ্দিন সমাজতান্ত্রিক ধারায় দেশ ও জাতি গঠনের চিন্তা করেছিলেন এবং আর্থ সামাজিক কাঠামোতে সমাজতান্ত্রিক ধারায় রূপান্তরের জন্য, সাম্রাজ্যবাদের থাবা থেকে যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশকে মুক্ত রাখবার জন্য, নির্ভরশীলতা কমাবার জন্য যে নীতি নির্ধারন করেছিলেন,

Dhaka University Institutional Repository

নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজনে শেখ মুজিব প্রথমেই তার মুলোৎপাটন করেছিলেন। একসময়ে শেখ মুজিবের মন্ত্রীপরিষদ থেকে তাজউদ্দিন আহমেদকে বিদায় নিতে হয়। এবং অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে এই দুই নেতৃত্বের, পরিস্কারভাবে দুই মুল্যবোধের নেতৃত্বের, পার্থক্যের ধরণ জাতির কাছে স্পষ্ট হয়েছে। মঈদুল হাসান তা তুলে ধরেছেন এভাবে:

"নির্মীয়মান বহুদলীয় জাতীয় ঐক্য কাঠামোর পরিবর্তে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ দলীয় শাসন প্রবর্তন, আর্থসামাজিক মৌলরূপান্তরের প্রধান শক্তি হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের কেবল অনুগত অংশের সমবায়ে জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন, এবং দেশের অর্থনৈতিক পুর্নগঠনের জন্য সরাসরি মার্কিন সাহায্য গ্রহণের নীতি মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে গৃহীত হয়।"[৮]

জাতীয় সরকার গঠনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আওয়ামী লীগের মধ্যেও একটা বৃহৎ অংশ একপেশে হয়ে যাচ্ছিল। আওয়ামী লীগের মধ্যে বামপন্থীদের একটি অংশ ছিল যারা ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে সংস্কারমুখী রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিল অগ্রগণ্য। এই সংস্কারমুখী অংশের প্রভাবেই শেখ মুজিব সমাজতান্ত্রিক ধারা অনুসরণ করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের এই ছাত্র সংগঠনে প্রথম ভাঙ্গন শুরু হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীন দেশে "জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে শেখ মুজিবের অক্ষমতায় হতাশ হয়ে তারা নিজেদের আদর্শগত ও রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বিকল্প পথ অনুসন্ধান করছিলেন"[৯]। এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নামে (জাসদ) দল গঠন করেন। তারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যায় সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে। আরেকটি অংশ 'মুজিববাদ' প্রচারের জন্য শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। শেখ মুজিব তাঁর ভাগ্নে মনির 'মুজিববাদের আদর্শে' নেতৃত্বাধীন অংশকে প্রথম থেকেই সমর্থন দিয়ে আসছিলেন। আওয়ামীলীগের ভেতর থেকে জাসদের অভূত্থান দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিমন্ডলকে প্রভাবিত করেছে। "এ সময় নিষিদ্ধ ঘোষিত ডানপন্থী দলগুলোর নেতা কর্মীরাও জাসদের জনসভায় যোগ দিয়ে সভার আয়তন স্ফীত করে তুলতে বিশেষভাবে সহায়তা করতে থাকেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বামপন্থী কর্মীরা জাসদের পতাকাতলে এসে সমবেত হতে থাকেন"[১০]। এভাবে সরকারের বাইরে সরকারবিরোধী প্রস্তুতি অব্যাহত থাকে। জাসদ 'গণবাহিনী' নামে সশস্ত্র বাহিনী গঠন ও 'গণকণ্ঠ' নামে পত্রিকা ও প্রচার করেছে। সে সময় রাজনৈতিক অঙ্গনে ন্যাপ

Dhaka University Institutional Repository

(ভাসানী) ও এই জাসদ ই ছিল বিরোধী দল হিসেবে সক্রিয়। দলীয় ভাঙ্গনের এ পর্যায়ে ১৯৭৩ সালে সাধারন নির্বাচনের পর অক্টোবর মাসে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের সাথে সিপিবি (মনিসিং), ন্যাপ (মোজাফফর) মিলে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট, ঘোষনা করে। এরা ছিল মস্কোপন্থী। এবং সরকার এই সংযোজিত তিনটি দলকেই 'দেশ প্রেমিক' মনে করত ফলে যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাদের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশের পুণর্গঠন এমনিতেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয় তাছাড়া শেখ মুজিবের দেশ পরিচালনার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাও ছিলনা। এর মধ্যেই রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলো যুদ্ধবিদ্ধস্ত একটি দেশের জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে বিভক্তির দিকে নিয়ে যায়। বিরোধী দলগুলোর প্রতি তিনি সহিষ্ণু না হয়ে কঠোর হয়েছেন। নিজের দলকে সহযোগিতা করে অন্য দলকে দমন করতে গিয়ে দেশের আভ্যন্তরীন নাশকতা রোধে রক্ষী বাহিনী গঠন করেছিলেন। ১৯৭৪ এক ভয়াবহ বন্যা হয় এবং দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশ সরকার অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়। দেশের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়, জাতীয়করণ নীতি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের লুট পাটের ফলে বিধক্ষস্ত হয়ে পড়ে। "সরকারের বৈদেশিক নীতি বাস্তব অবস্থাকে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে পরিচালিত হতে থাকে। সরকারী প্রচার মাধ্যম ঘন ঘন আমেরিকা ও অন্যান্য পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংগে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখতে থাকে"[১১]। দেশকে দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাতে "বাংলাদেশ কিউবার সংগে বানিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করে মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়"[১২]। একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, আরেকদিকে বন্যা, দুর্ভিক্ষ সংকট মোকাবেলায় অপারগতা তাঁকে মূলত জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে তিনি রাষ্ট্রে ২৮ জানুয়ারী জরুরী অবস্থা জারী করেন এবং "২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে সংসদীয় গণতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে যায়। আওয়ামীলীগসহ সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত ঘোষনা করে 'বাকশাল' (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) নামে একক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। মৌলিক অধিকারসমূহ বাতিল করা হয়। সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রন আরোপ করা হয় এবং বিচার বিভাগকে নিয়ে আসা হয় রাষ্ট্র

Dhaka University Institutional Repository

যন্ত্রের নির্বাহী বিভাগের অধীনে"[১৩]। তাঁর সারাজীবনের আদর্শ বিরোধী এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিজেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছিলেন। এ প্রসংগে একটি মন্তব্য স্মরন করা যায়:

"পাকিস্তানী শাসক- শেখ মুজিবকে বহুবার আটক করেছে, কিন্তু বন্দী করতে পারেনি। আবদ্ধ অবস্থাতেও তিনি মুক্তই রয়ে গেছেন, জনগণের সংগে থেকেছেন। জনগণ থেকেছে তার সংগে, দ্বিতীয় বিপপ্লব বলি, কিংবা বাকশালই বলি এ হচ্ছে বন্দী মানুষের হতাশ পদক্ষেপ। ঐ পদক্ষেপ তাঁকে আরো বেশী বিচ্ছিন্ন করল, তার শক্তির উৎস ছিল যে জনগণ সেই জনগণের কাছ থেকে"[১৪]।

এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগে সেনাবাহিনী এক 'অপ্রচলিত কায়দায়' শূন্যতা পূরনের অভূথান ঘটায় এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট স্ব-পরিবারে শেখ মুজিব নিহত হন।

বাংলাদেশের প্রথম নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচয় দিতে সক্ষম হয়নি। দলের আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব কলহ শেষ পর্যন্ত গভীর ষড়যন্ত্রে পরিণত হয়। এ অবস্থাকে আবুল কাসেম ফজলুল হক তুলে ধরেছেন এভাবে :

"..... আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীন বিরোধের সমাধান হয়নি তাতে। কয়েক মাসের মধ্যেই শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গঠন করা হয় বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ)। এতে তার চেষ্টা ছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মত একদলীয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চলে যাওয়া। শেখ মুজিব আশা করেছিলেন যে, বাকশাল প্রবর্তিত হলে তিনি তার হারানো জনপ্রিয়তা ফিরে পাবেন- আওয়ামী লীগও জনপ্রিয় হবে। কিন্তু বাকশাল গঠনের ফল পুরোপুরি উল্টো হয়। বাকশাল গঠনের ফলে শেখ মুজিবের শক্তি বাড়েনি, বরং এতে দল সহ শেখ মুজিব রাতারাতি জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্রের প্রক্রিয়া দ্রুত বিকশিত হতে থাকে। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের এবং তৎকালীন আওয়ামী লীগের যে সাংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা,ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের সংস্কৃতি।"[১৫]

এই চরম গণতন্ত্রহীনতা ও রাজনৈতিক হতাশার মধ্যে ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে খন্দকার মুশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হন। "শেখ মুজিবরের মৃত্যু ও এবং ক্ষমতা গ্রহনের পাঁচ দিনের মাথায় মুশতাক ১৫ আগস্টের ঘটনা এবং তার পরবর্তী সকল সরকারী কার্যক্রমকে বৈধতা প্রদানের লক্ষ্যে দেশে সামরিক আইন জারি করেন।"[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

"আন্তর্জাতিকভাবে মুশতাকের সরকার পাকিস্তান, সৌদি আরব ও চীনের তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি অর্জন করেন।"[১৭]

৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘটিত হয় 'ক্যু' ও পাল্টা 'ক্যু'। এদের মধ্যে ছিল মুজিব সমর্থক, মুজিব বিরোধী এবং জাসদ সমর্থক। ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ অভ্যুত্থান ঘটালে জিয়াউর রহমান গৃহবন্দী থাকেন এবং কর্ণেল তাহের খালেদ মোশাররফের সরকারকে উৎখাতের জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালাতে থাকে। সেনাবাহিনীর মধ্যে সিপাহীদের সমন্বিত করেন এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কর্মধারার সাথে জাসদকে সমন্বিত করে ক্যান্টনমেন্টের বাইরের জনতাকে এই অভ্যুত্থানের সংগে সম্পৃক্ত করেন। এরই মধ্যে ৩ নভেম্বর রাতে 'জেল হত্যা' সংঘটিত হয়।

এই জেল হত্যায় জাতীয় চার নেতা নিহত হয়। মুজিব সমর্থক খালেদ মোশাররফ সিপাহীদের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, তবে তাঁকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে সেনাবাহিনীর প্রধান করা হয় এবং জিয়াউর রহমান পদত্যাগ করেন। ৩-৫ নভেম্বর খন্দকার মোশ্‌তাক নামে মাত্র প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ৫ নভেম্বর সামরিক আইন অধ্যাদেশ বলে বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করে পদত্যাগ করেন। মুজিব বিরোধীরা আপাতত পরাজিত হল। কিন্তু মুজিব সমর্থকদের পরাজিত করতে কর্নেল তাহের সৈনিক সংস্থার পক্ষ থেকে ১২ দফা দাবীসম্বলিত প্রচারপত্র বিলি করে এবং সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান ঘটিয়ে জিয়াকে বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান করেছিল। এভাবে জাসদের সহায়তায় জিয়াউর রহমানের উত্থান ঘটে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় কর্নেল তাহেরের ফাঁসী হয়। সব শক্তির মধ্য থেকে জিয়াউর রহমান নিজেকে গোছাতে থাকেন এবং "ঘটনাবহুল এবং বিপজ্জনক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অনুপ্রবেশ করে জিয়া মূলত মোশতাক অনুসৃত রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন। শুধু ব্যতিক্রম ছিল এই যে, বেসামরিক একজন নেতা হিসেবে মুশ্‌তাক যেখানে সশস্ত্র বাহিনীতে নিজের ক্ষমতাভিত্তি তৈরী করতে পারেননি, সেখানে প্রথম থেকেই জিয়ার ক্ষমতাভিত্তি ছিল সেনাবাহিনীর উপর সুদৃঢ় ও শক্তিশালী।"[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

জিয়াউর রহমানের শাসনকাল

বাঙালী জাতীর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ ঘটে যুদ্ধোত্তর কালের রাজনৈতিক অস্থিরতায়। ১৯৭১-১৯৭৫ কালপর্বে স্বাভাবিক ও সঙ্গত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটেনি জাতীয় জীবনে। সামাজিক জীবনে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন যুদ্ধবিদ্ধস্ত রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জনমনের প্রত্যাশা এবং প্রত্যাশা পুরনের ব্যর্থতার জন্য নতুন রাষ্ট্রের নানা সীমাবদ্ধতা অনেকটা দায়ী হলেও ক্ষমতার অপব্যবহারই প্রধানত জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা কে হতাশ করেছে প্রবলভাবে। এই অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও স্তব্ধ রাজনৈতিক পরিবেশে "জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় আসেন তখন দেশে প্রবল আওয়ামী লীগ বিরোধী প্রায় সকল শক্তির সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সমর্থন তিনি লাভ করেছিলেন।"[১৯] এই সুযোগের সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন সতর্কভাবে। তিনি দোদুল্যমান জাতীয়তাবাদের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাকিস্তানীরা যে সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় বুর্জোয়া হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি জিয়াউর রহমানের শাসনকালে জিয়াউর রহমানও বাংলাদেশকে আমলাতান্ত্রিকভাবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করতে যা যা করবার প্রয়োজন ছিল তাই করেছেন।

সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাদ দিয়েছেন । তিনি বিভিন্ন দলের রাজনীতিবিদদের রাজনীতির আদর্শকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছেন। তাদেরকে পরাস্ত করতে কঠোর ছিলেন। শুধু তাই নয় নির্যাতন, নিপীড়ন, প্রলোভনের জাল বিস্তার করে সবাইকে নিজের সমর্থনে কাজে লাগিয়েছেন। এ সম্পর্কে আবুল কাসেম ফজলুল হক দল ও ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেছেন :

'প্রেসিডেন্ট জিয়া মাওলানা ভাসানীর ন্যাপ ও দু একটি কমিউনিস্ট গ্রুপ ও আওয়ামী লীগ থেকে নেতা জোগাড় করে মন্ত্রী বানাতে সক্ষম হন। ইউসুফ আলী, কে,এম ওবায়েদুর রহমান, শফিউর রহমান, কাজী জাফর আহমদ, মির্জা গোলাম হাফিজ, ব্যারিস্টার আব্দুল হক, সিরাজুল হোসেন খান, ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম, কর্ণেল আকবর হোসেন, এনায়েত উল্লাহ খান প্রমূখ জিয়ার মন্ত্রী হন। আবুল ফজলের মতো সম্মানিত ও প্রভাবশালী প্রবীণ লেখককে প্রথমেই তিনি মন্ত্রীর পদমর্যাদায় উপদেষ্টা বানিয়ে জাতির ইতিহাসের গতি উল্টানোর কাজ আরম্ভ করেন।...মাওলানা ভাসানীর ন্যাপ ও পিকিং পন্থী বলে কথিত বামপন্থীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জিয়ার সমর্থনে এগিয়ে যায় এবং পরে বি.এন.পি তে যোগ দেয়।'[২০]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিকভাবে জিয়াউর রহমান তাঁর ক্ষমতাভিত্তি সংহত করতে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তা হলো "১) সেনাবাহিনীতে পর্যাপ্ত শৃঙ্খলা ও ক্যান্টনমেন্ট সমূহে শান্তি পুনঃস্থাপন করা; ২) সৈনিকদের মধ্যে নিজের জনপ্রিয়তা বহাল রাখা; ৩) জাসদ ও বাকশাল ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও নেতার সঙ্গে সম্পর্ক সাবলীল করা; ৪) আত্মগোপনরত বামপন্থী ও অন্যান্য চীনপন্থী দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার আয়োজন করা; ৫) একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অধীনে বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত ও চাকুরীচ্যুত উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন অফিসারদের দ্বারা সরকার পরিচালনার ব্যবস্থা করা; ৬) ডানপন্থী দল ও নেতাদের সঙ্গে সুদূরপ্রসারী যোগাযোগ রক্ষা করা; ৭) ভারত বিরোধী ও সোভিয়েত বিরোধী শক্তির আস্থা ও সমর্থন অর্জনের জন্য সংবিধানের কতিপয় বিধান সংশোধন করা-যেমন; দালাল আইন প্রত্যাহার, নাগরিকত্বের সংজ্ঞার পরিবর্তন, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনে সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ইত্যাদি।; ৮) গ্রামীন জনগণের মধ্যে সমর্থনভিত্তি সম্প্রসারিত করা; ৯) বাকশালী সমাজতন্ত্রভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রবর্তন করা এবং সর্বশেষে ; ১০) চীন, ইসলামী বিশ্ব এবং পশ্চিমা দাতা দেশ গুলোর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার করা।"[২১]

এক্ষেত্রে একটি কথা সত্য যে, শেখ মুজিবের শাসনামলে সৃজনশীল নেতৃত্বের ব্যর্থতার সুযোগ জিয়াউর রহমান নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের নেতৃত্বের প্রকৃতিকে সংবিধানের মধ্যে প্রোথিত করেছিলেন এমনভাবে যেন রাজনীতি সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। এমাজউদ্দিন আহমদ বলেছেন- "তিনি রাজনীতিতে এলেন এবং রাজনীতির প্রধান উপজীব্য যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সরকারের প্রকৃতি, এমনকি এর ভিত্তিভূমি যে সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি তাদের রূপরেখার আমূল পরিবর্তন সাধন করলেন। বাংলাদেশ রাজনীতির এসব ক্ষেত্রে তিনি যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন তাই জিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের সূচক, তার উন্নতর চিন্তা-ভাবনার পরিচায়ক।"[২২]

Dhaka University Institutional Repository

জিয়ার 'আমূল পরিবর্তন' দেশ ও জাতির 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন' করেছে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে। তাঁর ক্ষমতায়নকে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর চিহ্নিত করেছেন যেভাবে তা উদ্ধৃত করছি -

"প্রথম স্তর হচ্ছে ঃ ক্যু এর মাধ্যমে সামরিকতা প্রবর্তন, রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণ, রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রীয় আমলাদের শুদ্ধিকরণ কিংবা বহিষ্কার। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে ঃ রাজনৈতিক সমর্থন নির্মানের জন্য স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্কার। তৃতীয় স্তর হচ্ছে ঃ প্রেসিডেন্টসিয়াল গণভোট। চতুর্থ স্তর হচ্ছে ঃ সংবিধান সংশোধন এবং 'সরকারী দল' প্রতিষ্ঠা।"[২৩]

এই ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার স্ট্রাটেজির সাথে আইয়ুব খানের স্ট্রাটেজির সাদৃশ্য সহজেই লক্ষনীয়। আইয়ুব খান সিভিল সমাজের মধ্যে সামরিক কর্তৃত্ব প্রবিষ্ট করবার জন্য এই একই স্ট্রাটেজি অবলম্বন করেছিলেন। তাই "এই স্ট্রাটেজির দরুন জনসাধারণ নয়, সরকার এবং সরকারের পশ্চাৎপট হিসেবে সামরিক বাহিনী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।"[২৪]

নিষিদ্ধ ঘোষিত দলগুলোকে রাজনীতি করবার সুযোগ দিয়ে সিভিল সমাজের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য বিরোধী শক্তিগুলোকে পুণর্জীবন দান করেছে জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক অফিসার। সেনাবাহিনীতে গোয়েন্দা বিভাগে কাজের অভিজ্ঞতা থাকায় নিজের সরকারের ভাবমূর্তি গঠনে কাজে লাগিয়েছেন গোয়েন্দা বিভাগকে। গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে তিনি সামরিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিজে মুক্তিযোদ্ধা হয়েও তিনি তাঁর প্রশাসনে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তিদের প্রাধান্য দিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর দলের ভিতরে 'দলছুট' নেতাদের কোন গণতান্ত্রিক আদর্শ ছিল না। সেনাবাহিনীর ভেতরে দুটি পক্ষ তৈরী হয়েছিল। এক পক্ষে ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অংশ, আরেক পক্ষে ছিল পাকিস্তানে যারা বন্দী ছিল তারা। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অংশ পাকিস্তানে বন্দী অংশের আধিপত্য মেনে নিতে চায়নি। সৈনিকদের এ অসন্তোষ ক্রমেই উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হয়। ১৭ বার ব্যর্থ অভ্যুত্থান হলেও শেষ অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান ৩০ মে ১৯৮১ চট্টগ্রামে নিহত হন।

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদের শাসনকাল

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরে উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহন করেন। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় তাঁকে এ দায়িত্ব নিতে হয়। বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নেন এবং নির্বাচিত হন। সশস্ত্রবাহিনীর পরোক্ষ সমর্থন, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অনৈক্য বিচারপতি সাত্তারের বিজয়কে সুনিশ্চিত করে। কিন্তু সাত্তার সরকার যতদিন রাষ্ট্রপতি ছিলেন ততদিনই তিনি অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ছিলেন। রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী সমাজ এবং তাঁর নিজের দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে থাকে। সর্বস্তর থেকে নানা অসন্তোষ আন্দোলনে রূপ নেয়। এমতাবস্থায় সেনা বাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এইচ.এম. এরশাদ শুধুমাত্র জনগণকে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবার জন্য, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে থাকেন এবং একসময় দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হলে; বিচারপতি সাত্তার সামরিক আইন জারি করে লেঃ জেনারেল এরশাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। জিয়াউর রহমানের পর বিচারপতি সাত্তার সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা সংরক্ষনের জন্য অধিষ্ঠিত হলেও সাত্তার ছিলেন বয়োবৃদ্ধ, ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী, সেনাবাহিনীর সমর্থন পুষ্ট। তাঁর ব্যক্তিগত দুর্বলতা, অদক্ষতার জন্য সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় গণতন্ত্রের পরিবর্তে সামরিক শাসন আসার পূর্বশর্ত তৈরী হয়।

জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক ধারাকে বেগবান করা সম্ভব ছিল। জিয়া সামরিক শাসক হলেও সাফল্যজনকভাবে জনগণের মধ্যে সমর্থন ভিত্তি তৈরি করে গণতন্ত্রে উত্তরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন। সাংবিধানিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ৬ষ্ঠ সংশোধনী এনে সাত্তারকে সাহায্য করবার অন্তরালে এরশাদের ছিল ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার অভীপ্সা। জিয়ার মৃত্যু পরিস্থিতিকে সামলে উঠে, নিজের ভাবমূর্তি গঠন এবং রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের আয়োজনের জন্য বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ সাত্তারকে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে নিযুক্ত করা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূলে। রুগ্ন গণতন্ত্রের ধারাটিকে গতিশীল করতে সেসময় সাত্তার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন ও সমর্থন বি.এন.পি করতে পারেনি। এরশাদের সামরিকতন্ত্র যখন ২৪ মার্চ ১৯৮২ রাষ্টক্ষমতা দখল করেছিল তখন কোন দলও প্রতিবাদ-

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিরোধে এগিয়ে আসেনি। ক্ষমতা দখলের পর সাত্তার সরকারের একের পর এক ব্যর্থতার কথা তুলে ধরে 'জনগনের সামরিক শাসন' বলে সামরিকতার সমর্থনে যুক্তি তুলে ধরে এরশাদ বলেছেন, গণতন্ত্র পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

এরশাদ সরকার গণতন্ত্র পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সামরিক আমলাতন্ত্রের সমর্থন নিয়ে এগিয়ে গেছেন। বেসামরিক আমলতন্ত্রকেও সুযোগ সুবিধা দিয়ে সমর্থনে রেখেছিলেন। এ সম্পর্কে মওদুদ আহমদ বলেন:

"জিয়া ও এরশাদের আর্থ-সামাজিক দর্শন ছিল মোটামুটিভাবে একই ধরণের। রাজনীতিতে দলছুট নেতাদের প্রাধান্য দিয়েছেন এবং দুটি প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও বি এন পি তে ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৮৫ সালের প্রথম দিকে ভাঙ্গনের সূত্রপাত ঘটে । ইতোমধ্যে বি এন পি'র একটি অংশের নেতা শামসুল হুদা চৌধুরী ও ডঃ এম এ মতিন এবং আওয়ামী লীগের সাবেক চীফ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এরশাদের সঙ্গে হাত মেলাল। উপরন্তু জিয়াউদ্দিন আহমেদ, আনিসুল ইসলাম মাহমুদের মত বি এন পি'র কিছু নেতা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং দলবিহীন বিশেষ ব্যক্তি আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এরশাদের হাত শক্তিশালী করবার জন্য এগিয়ে আসেন।"[২৫]

এরশাদ সরকার সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের সুযোগ সুবিধা দিয়ে সবসময় সমর্থনে রেখেছেন। নির্ভর করেছেন সামরিক আমলাদের উপর। তিনি তাঁর সরকারকে স্থিতিশীল রাখতে আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছেন এবং বেসামরিক প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আমলাতন্ত্রকে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার ফলে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় টিকে ছিলেন। স্থিতিশীলতার এই নীতি সাম্রাজ্যবাদ বিকাশের জন্যও অনুকূল ছিল।

জিয়া সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণকে এরশাদ আরো গতিশীল করে বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এসবের মধ্য দিয়ে শাসক হিসেবে তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেও সমন্বয় সাধন করে সামরিকতন্ত্রকে জিইয়ে রেখেছিলেন। "তিনি গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিধক্ষস্ত করেছেন। লুণ্ঠন করেছেন জাতীয় সম্পদ। অমার্জনীয় অপচয় ঘটিয়েছেন বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদের। জাতীয় জীবনে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অবাধ ব্যবহারের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে প্রশাসনের ভাবমূর্তি অবনত করেছেন। ক্ষমতা দখল থেকে শুরু করে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দেশের রাজনৈতিক জীবনকে বন্দী করে রেখেছিলেন নিজস্ব খেয়াল খুশীর চার দেয়ালের অভ্যন্তরে।"[২৬]

এরশাদ কর্তৃক রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তন বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়াশীলতার জন্ম দিয়ে বাংলাদেশের জনগণকে বিভক্ত করে পশ্চাৎপদ করেছে। তিনি এর মাধ্যমে ধর্মভীরু মানুষের মন জয় করলেও তাঁর অনেক মহৎ উদ্যোগ সফল হয়নি। জাতি বিভক্তি, আমলাতন্ত্র, দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকায়ণে বিশেষভাবে সহায়ক হলেও, ভূমি সংস্কার, উপজেলা পদ্ধতি, বাধ্যতামূলক বাংলা ভাষার ব্যবহার, শিক্ষার উচ্চস্তরে বাংলা মাধ্যম চালুকরণ, বিচার বিভাগ ও প্রশাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণ, ওষুধ নীতি কোনোটাতেই ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি। রাজনীতিতে সক্রিয় বুদ্ধিজীবীদের ও ছাত্র সংগঠনগুলোর ঢাকা কেন্দ্রিক আন্দোলন ১৯৯০ সনের শেষ দিকে বিরোধীদলীয় "নাগরিক ভদ্রলোকদের অভ্যুত্থানে"[২৭] রূপ নেয়। বিরোধী দলগুলো এর আগেও এরশাদের স্বৈরশাসনের প্রশ্ন তুলেছে। বিশেষ করে তার আনুষ্ঠানিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে বিরোধী দলগুলো মধ্য থেকে। কিন্তু বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্যের অভাবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ৮ দলীয়, ৭ দলীয় ও ৫ দলীয় জোট ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে গেছে এবং তাঁরা ঐক্যমত পোষণ করেছে একটি বিষয়ে যে, জেনারেল এরশাদ প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠান হলে তারা তা মেনে নেবেনা এবং একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে।

'৯০ এর শেষদিকের এই আন্দোলন ছাত্র সমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে। এতে সাফল্য লাভের জন্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে "২২ টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও গঠন করা হয়।"[২৮]

ডাঃ মিলন হত্যার পর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। যদিও ২৭ নভেম্বর জরুরী অবস্থা জারির পর সংবাদ পত্র বন্ধ থাকে ৮ দিন এবং বার্তা সংস্থার প্রতিবেদনও সেন্সর করা হতো তারপরও এসময় আপামর জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আন্দোলনটি ছিল ঢাকা কেন্দ্রিক। সুতরাং এ অভ্যুত্থানে ছাত্র শিক্ষক, আইজীবী চিকিৎসক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ীরা

Dhaka University Institutional Repository

সামিল হন। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের দুই প্রধান সাহায্যকারী দেশ বৃটেন ও জাপান আন্তর্জাতিক সাহায্য বন্ধের হুমকি দেখায়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও পরিস্থিতি মোকাবেলায় অপারগতা প্রকাশ করে। জেনারেল এরশাদ যেহেতু সামরিক বাহিনী নির্ভর সরকার সুতরাং তিনি পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেন। সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় সেটা একদফায় পরিণত হয় এরশাদের পদত্যাগের দাবীতে। শেষ পর্যন্ত এরশাদ ৪ ডিসেম্বর তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন এবং ৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে পদত্যাগ করেন। এবং এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ গণতন্ত্রের পথে নতুন যাত্রা শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার শাসনকাল

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য স্বপ্ন ও সম্ভাবনার জন্ম হয়েছে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বরে। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার সে সময় যে সুশাসনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তাকে বাংলাদেশের ইতিহাসে ব্যতিক্রম বিবেচনা করা হয়। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কাজ ছিল নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সরকার গঠন করে এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ নির্বাচিত সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে নিজ পদে ফিরে যান। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বা স্বৈরশাসনের আমলে কোন সময়ই গণতন্ত্র কি বা গণতন্ত্রের রূপরেখা নিয়ে কোনও দলই সুস্পস্ট কোন ধারনা দেয়নি। "শুধুমাত্র ভোটাভুটি সর্বস্ব গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তারা কোলাহল করেছে।"[২৯]

সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্যেই শুধু গণতন্ত্র থাকে না। নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে এটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছে সবাই আশা করে কিন্তু শুধুমাত্র নির্বাচন প্রক্রিয়া দিয়ে পৃথিবীর কোন দেশে গণতন্ত্র কায়েম হয়নি। দলগুলোর মধ্যেও গণতান্ত্রিক আদর্শ থাকতে হয়। ১৯৭৫ সনে মুখ খুবরে যাওয়া গণতন্ত্র বারবার সামরিকতন্ত্রের মধ্যে থেকেছে। ১৯৯০ সালের এরশাদ বিরোধী আন্দোলনও তা শুধুমাত্র নির্বাচন সর্বস্বতায় ঠাঁই করে নিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্র প্রবর্তন করার প্রেক্ষাপট তৈরী করতে ও বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তদুপরি প্রত্যেকটি দলই প্রচার করে তাদের দলই গণতান্ত্রিক দল।

পশ্চাৎপদ দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ ও চর্চা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরাধীনতা থেকে মুক্ত হবার জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এগিয়েছে কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল বা নেতার আদর্শগত অবস্থান থেকে নয়। দলের মধ্যে এজন্য কোন আদর্শিক গণতন্ত্রের ভিত্তি তৈরী হয়নি। এরকম দল সরকার গঠন করলেও একই চারিত্র্য বজায় থেকেছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়নের জন্য এটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া প্রত্যেকটি দল নিজেদের স্বার্থে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা দাঁড় করেছে এবং দলীয় নেতাকর্মী ও তাদের অঙ্গসংগঠন, দলীয় বুদ্ধিজীবীরা ক্রমাগত আপন দলের হয়ে নিজেদের শর্তে গণতন্ত্রের সাফাই

Dhaka University Institutional Repository

গেয়ে থাকেন। সর্বত্র জনগণের কথাই বলা হয় কিন্তু কোন কাজেই জনগণের মত বিনিময় করার সুযোগ নেই। "১৯৯১ সনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে বিএনপি সরকার এরশাদ সরকারের ধারাবাহিকতায় গতানুগতিক রীতিতে রাষ্ট্রপরিচালনা করে।"[৩০]

দুই গণতন্ত্রের নেত্রীই কেউ 'গণতন্ত্রের মানসকন্যা' কেউ 'আপোষহীন নেত্রী' ইত্যাদি আখ্যা পেতে থাকেন। দলীয় প্রচারে একপক্ষ আরেক পক্ষকে ঘায়েল করবারও চেষ্টা চালাতে থাকে। অথচ তাঁদের মধ্যে ব্যবধান তেমন নাই। উভয় দলই উত্তরাধিকার ভিত্তিতে দলের প্রধান এবং ভবিষ্যৎ নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে নেতৃত্বের পরিবর্তন সম্পর্কে রক্ষণশীল। তারা নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির মত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আস্থা রাখেন কি না, সন্দেহ। উভয় দলই জনগনের কাজে জনগনের জবাবদিহিতার ব্যাপারটিকে আলোচনা সাপেক্ষে সংবিধানভিত্তিক ব্যবস্থায় পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছে। গণতান্ত্রিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হলো রাজনৈতিক দল। সেই দলগুলোর মধ্যেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নেই, পরমতসহিষ্ণুতারও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দুর্বল। এর ভিত্তিকে প্রাতিষ্ঠানিকতা দেওয়ার জন্য যে চর্চা তা কোন দলই করেনি। যা করেন তা হলো এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে সরকার উৎখাতের আন্দোলন। গঠনমূলক সমঝোতায় না এসে তারা উভয় দলই গণতন্ত্রকে কুক্ষিগত করে রেখেছে। আহমদ শরীফ এ ধরনের গণতন্ত্রকে "শ্রাবণের মেঘ ভাঙা রোদের মত ক্ষণস্থায়ী"[৩১] বিবেচনা করেছেন– যার মধ্যে মাঝে মাঝে সামরিক শাসনের আশঙ্কা থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

খ) আর্থ-সামাজিক অবস্থা

"বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে সাংস্কৃতিক কারণ রাজনৈতিক কারণের চেয়ে নগণ্য ছিল না।"[৩২] কিন্তু স্বাধীণ বাংলাদেশে সংস্কৃতি ও রাজনীতি একে অপরের পরিপুরক হয়নি। ধীর ধীরে সংস্কৃতি রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে চিত্তবিনোদন তথা বিলাসিতায় স্থান করে নিয়েছে আর রাজনীতিও সংস্কৃতিবিহীন শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। যুদ্ধবিধক্ষস্ত দেশের পুণর্গঠন সহজসাধ্য কোন ব্যাপার নয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পুণর্গঠনে সাংস্কৃতিক চেতনাকে ঠাঁই দেয়া হয়নি। তাই পুরনো শাসকদের অনুকরণে নতুন সমাজ গঠনের চিন্তা সাফল্যের প্রশ্নে হয়েছে সম্ভবনাহীন। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য দার্শনিক দারিদ্র্য এবং পাশাপাশি সাংস্কৃতিক এলিট সৃষ্টির ব্যর্থতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক পরিবর্তনের বিরাট প্রতিশ্রুতি, দলীয় কোন্দল, লুটপাটের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার ও সবশেষে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতিতে সাধারণ মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছিল যার ফলে জরুরী অবস্থা জারি ও সংবিধানের সংশোধনীর ঘূর্ণাবর্তে পূর্বের চেয়েও বাংলাদেশ ভয়াবহ অবস্থার শিকার হয়। রাজনৈতিক কর্মীদের ক্ষমতা সচেতনতার সাথে মনুষ্যত্ব সচেতনতার অভাবই এর জন্য দায়ী। যুদ্ধ বিধক্ষস্ত দেশের পুনর্গঠনে এ সময় অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নেয়া হয় ঘোষিত সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রায় দেড়শত আইনও প্রণয়ন করা হয়েছিল। যুদ্ধবিধক্ষস্ত দেশে কাঠামোগত স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং চারটি সাংবিধানিক মূল নীতি প্রতিষ্ঠায় গৃহিত পদক্ষেপ সমূহের সাফল্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পরিচালিত হয়েছিল মূলত পুঁজিবাদকে কেন্দ্র করে বুর্জোয়া নেতৃত্বে। প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগের শ্রেণী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ছিল না। "যে প্রতিষ্ঠান ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের কথা আগে থেকে প্রচার করেনি, সুযোগ পেলেই গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেছে, সেই প্রতিষ্ঠান যখন ক্ষমতায় গিয়ে আকস্মিকভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোষণা করে তখন তার পিছনে বিরোধী দলের মোকাবিলায় জনগণকে ভাওতা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ক্রিয়াশীল থাকে; তাতে কি সন্দেহের কোনো অবকাশ আছে?"[৩৩] আসলে শ্লোগানসর্বস্ব হয়ে পড়েছিল সরকারের রাষ্ট্রীয় আদর্শগুলো। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রবর্তন করেছিল অবস্থার

Dhaka University Institutional Repository

চাপে বাধ্য হয়ে আর বাস্তবায়ন করা ছিল আওয়ামী লীগের কঠিন চ্যালেঞ্জ। সমাজতন্ত্রের উপর নির্ভর করেই অন্যান্য স্তম্ভের গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু কার্যত এই সমাজতন্ত্র নামে মাত্র সমাজতন্ত্র ছিল। এর জন্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পররাষ্ট্রনীতির নানামুখী দ্বন্দ্ব-প্রতিক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও বলা যায়, আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক সংকট, আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা দ্রুত অকার্যকর হয়ে পড়া এবং সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য গৃহিত পদক্ষেপের ফাঁক ও ফাঁকির মধ্য দিয়ে তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকৃত চিত্র প্রকট হয়ে উঠে। জাতীয়করণ নীতি, ভূমি সংস্কার নীতি, ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগের সীমা নির্ধারণ এগুলোর মধ্যেই ঠাঁই করে নিয়েছে এমন এক নতুন শ্রেণী যারা পরবর্তীতে অর্থনীতিকে ধক্ষংসের পথে নিয়ে পুরো সমাজের মধ্যে, মানুষের প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যে সৃষ্টি করেছে বৈষম্য। এই বৈষম্যই শেষ পর্যন্ত সকল প্রকার নৈরাজ্যের মূলে কার্যকর ছিল।

জিয়াউর রহমান সংবিধান থেকে 'সমাজতন্ত্র' বাদ দিয়েছেন সুচিন্তিত লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। মুজিবের শাসনামলে রাষ্ট্রীয়করনের ফলে যারা ধনী হয়ে উঠেছিল তাদেরকে আরো ধনী হতে সাহায্য করেছিল তাঁর বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি। পুঁজিবাদকে উৎসাহিত করতে গিয়ে তিনি উন্নয়নের বক্তব্য প্রচার করেন। উৎপাদন বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট ও অফিস আদালত নির্মানে বিশেষ গুরুত্ব দেন। পুঁজিনির্ভর সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়ে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের পরিমাণ বাড়াতে থাকে। প্রকাশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী শক্তিগুলোকে বাংলাদেশে পুঁজিবিনিয়োগের জন্য আবেদন জানালে বাংলাদেশের সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদীদের জালে প্রথমেই আটকে পড়ে। অবাঞ্ছিত শর্তযুক্ত বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য সমাজ ও অর্থনীতিসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে স্বনির্ভরতার পথ থেকে পরনির্ভরতার দিকে পথ নির্দেশ করে। জিয়া সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন ঘটিয়ে মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়ালে সাংস্কৃতিক ভাবে স্কুলপন্থী ও মাদ্রাসাপন্থীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক কথা দুটো আবার রাজনীতিতে ফিরে আসে এবং ব্রিটিশ আমলের ও পাকিস্তান আমলের অনেক পুরাতন বিতর্ক নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। পরবর্তীতে গণতন্ত্রের কালেও স্বৈরতন্ত্রের এই ধারাবাহিকতা সমাজ জীবনকে ভিন্ন ভিন্ন দুটি গতি পথে ধাবিত করেছে। গণতন্ত্র হয়েছে স্বতস্ফুর্ত। বিবেক ও যুক্তি গণতন্ত্রের প্রধান দুই বাহু যা জনগনের অধিকার ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাবে। কিন্তু বাংলাদেশের গণতন্ত্রের যাত্রাপথেই বিবেক ও যুক্তিনির্ভরতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। " 'জনগনের

Dhaka University Institutional Repository

গনতন্ত্রের' পরিবর্তে সাম্রাজবাদ ও পুঁজিবাদ নির্ভর গণতন্ত্র চালু হয়েছে। ফলে সমাজ জীবনে, জাতীয় জীবনে হীনমন্যতাবোধ 'বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের ভেতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে।''[৩৪] ধনী, গরীব, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, শ্রমজীবী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত অশিক্ষিত শ্রমিক কৃষক সকল বাঙালীর মনের গভীরেই এই ব্যাধি ভালোভাবে আসন গেড়ে বসেছে।

এই হীনমন্যতাবোধের সুযোগে আধিপত্য ও নির্ভরশীলতার নীতি চাপিয়ে দিচ্ছে বিদেশী অর্থলগ্নিকারীরা। বাংলাদেশের অর্থনীতি শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সবই তাদের নীতির কবলে পড়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েছে। ১৯৯১ সালের গণতান্ত্রিক ধারার প্রথম পর্বে বিএনপি সরকার সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা করে। মুক্তবাজার অর্থনীতির মধ্য দিয়ে এসময় সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর শ্রমঘন গার্মেন্টস কারখানা গড়ে ওঠে।

এরশাদ সরকার দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে নিজের ক্ষমতাকে সুসংহত করেছেন। সমাজ জীবনের এই দুর্নীতির প্রভাব ছিল গভীর ও ক্ষতিকর। প্রকাশ্যে ঘুষ দেয়া নেয়া থেকে শুরু করে সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রেই নৈতিকতার অধঃপতিত রূপ বিরাজ করছিল। রুগ্ন গণতন্ত্রকে সামরিকতন্ত্রে পরিণত করতে গিয়ে ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করণে সিভিল প্রশাসনের দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকরন ছিল প্রয়োজনীয় এজন্য এরশাদ সরকার জনপ্রিয় অথচ ক্ষতিকর কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যার ফলে সমাজজীবন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। যেমন রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তন, শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন নির্ধারণ, বাংলাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বত্র ব্যবহার করা, উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা প্রবর্তন করা ইত্যাদি। এগুলো প্রবর্তনের ফলে সমাজ দুটি দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এক. পশ্চাৎপদ লোকদের সমর্থন তিনি লাভ করেন। দুই. কেউ কেউ উচ্চাসনেও বসেন ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উদ্ভব ঘটিয়ে গণতন্ত্র নিষ্পেষণে তাঁদের কাজে লাগাতে সক্ষম হন। আর উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম বাংলা প্রবর্তিত হওয়ায় ছাত্র সমাজ মূল জ্ঞান বিজ্ঞানের স্রোত থেকে দূরে সরে যায়। উন্নত দর্শন, চিন্তা-চেতনা থেকে নতুন প্রজন্ম বঞ্চিত থাকে। এরশাদের পতনের পর গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি মোটামুটি এরকম- সম্রাজ্যবাদের লগ্নি পুঁজির কমিশনে

Dhaka University Institutional Repository

দেশীয় পুঁজিপতিরা কোটিপতি হয়। মুৎসুদ্দি ব্যবসায়ী আমলারা অবাধ পুঁজির প্রাবল্যে রাজনীতিতে সক্রিয় হস্তক্ষেপ শুরু করেছে। সংসদে আসন দখল করে রাজনীতিকেও কুলষিত করেছে। অনুৎপাদিত খাতে নতুন নতুন বিনিয়োগ করে জাতীয় অর্থনীতির সিংহ ভাগ অংশ বিদেশে পাচার করেছে। ফলে রপ্তানী বাড়লেও আমদানী নির্ভর বাজার ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছে। এনজিওদের ব্যাপক প্রচার প্রসার এসময় সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে নানা সুযোগ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেবামূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাদের পরিকল্পনার বীজ ছড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে পরনির্ভরশীলতার পথ নির্দেশ করেছে। গণতান্ত্রিক সময়ের এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন স্বৈরতন্ত্রের চেয়েও মারাত্মক ও হুমকিস্বরূপ। তাছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্রের যে নিম্নগতি তাতে সংসদীয় সমাধান বলে কিছু থাকে না। "বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে সদস্যদের আলোচনার মান পর্যবেক্ষণ করলে যে কেউ এই মন্তব্য করবেন যে, এটি শুধু অপরিণত নয়, অপরিশীলিত এবং অমার্জিতও বটে। ....বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু রাজনৈতিক নেতানেত্রীর মধ্যে গণতান্ত্রিক মন এখনোও সৃষ্টি হয়নি।"[৩৫]

গণতন্ত্রের যাত্রাপথে সংসদীয় গণতন্ত্রের এই সংস্কৃতি সমাজ জীবনে ব্যক্তিক মূল্যবোধের উপর এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

গ) প্রযুক্তির বিকাশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির রূপান্তর

বিজ্ঞান জীবনের কাছাকাছি এসে প্রয়োজনের কাজে নিয়োজিত হয়েছে। জন্ম হয়েছে প্রযুক্তির। "প্রযুক্তি বিজ্ঞানেরই সম্প্রসারণ। প্রযুক্তি হল বিজ্ঞানের সেই অংশ যা মানুষের শ্রমকে লাঘব করে- যা দ্বারা বিজ্ঞানের আবিস্কার- উদ্ভাবন মানুষের জীবনযাত্রাকে সমৃদ্ধ উন্নত ও আনন্দপূর্ণ করে তোলে।"[৩৬] প্রযুক্তিনির্ভর জীবন এখন সহজ সরল সুন্দর সুখময়। নৈতিকতা বর্জিত প্রযুক্তি জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। বাংলাদেশে প্রযুক্তির প্রসার ঘটেছে দুই ভাবে । এক. জীবন যাত্রার মান উন্নত করণে। দুই. আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহারে। সেজন্য আজকের বাংলাদেশ প্রযুক্তি ব্যবহারে জীবযাত্রার মান উন্নত হয়েছে, প্রকৃতি নির্ভরতা থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছে কিন্তু পাশাপাশি উন্নত দেশগুলোর উন্নত প্রযুক্তি গ্রহন করে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের আধিপত্য বিস্তারের পথকে সহজ করে দিয়েছে। "প্রযুক্তিতে অগ্রসর জাতিসমূহ পশ্চাৎবর্তী দুর্বল জাতিসমূহের উপর আধিপত্যের সুযোগ প্রসারিত করে চলেছে। এর ফলে সংকট গভীরতর হয়েছে। বাংলাদেশও সঙ্কটাপন্ন।"[৩৭]

জৈবপ্রযুক্তির বিকাশ বাংলাদেশকে সম্ভাবনার পথে ধাবিত করেছে মানুষের জীবনের মান উন্নত হয়েছে। বাংলাদেশে জৈব প্রযুক্তি অনেক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিলেও তথ্যপ্রযুক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার বাংলাদেশকে পরাধীনতার পথ নির্দেশ করে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে পরাধীন ও দুর্বল জাতিতে পরিণত হবার সব আয়োজন তথ্য প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে আধিপত্যবাদীদের আজ নিয়ন্ত্রণে। প্রযুক্তি গ্রহনে রাজনীতির কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। দলীয় সরকার সাধারণ মানুষের ভাগ্যবদলের চাকা ঘোরাতে নতুন নতুন প্রযুক্তি আমদানী করছে আর সেই সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তা সহযোগী আধিপত্যবাদীরা 'এককেন্দ্রিক' বিশ্ব ব্যবস্থার (Globalization) নীতি চাপিয়ে দিচ্ছে।

প্রযুক্তির প্রভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর নতুন নতুন অবদান বাংলাদেশের গরীব মানুষের জীবন ও মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করছে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতি। সেক্ষেত্রে প্রযুক্তি হলো মূল হাতিয়ার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যবস্থা দ্বিকেন্দ্রিক রূপ লাভ করেছিল। এক. ওয়াশিংটন, দুই. মস্কো।

গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী নীতি নিয়ে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রকে বিশেষ করে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে নিজেদের কর্তৃত্বের আওতায় নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ করে প্রচারকার্য চালাত। ওয়াশিংটনের যুদ্ধবাদী নীতি, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির কঠোর সমালোচক ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেজন্য তারা ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের কাজে প্রচারকার্য দিয়ে সহায়তা করত। এভাবে ওয়াশিংটন ও মস্কো কেন্দ্রের মধ্যে তীব্র উত্তেজনাকর প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন

Dhaka University Institutional Repository

বিলুপ্ত হয়ে ১৫টি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। বিশ্ব ব্যবস্থা পাল্টে গিয়ে এককেন্দ্রিক (ওয়াশিংটন) হয়ে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে পুঁজিবাদ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। ওয়াশিংটন বিশ্বায়ন (Globalization) নামে এক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে এককেন্দ্রিক করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বাংলাদেশও তথ্য প্রযুক্তি (Information technology) ও জৈব প্রযুক্তির (Bio technology) উন্নতির ধারায় উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে এবং প্রযুক্তির মালিকানা ও কর্তৃত্ব পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার কাছে ছেড়ে দিয়েছে।

ফলে বাংলাদেশে উচ্চ ফলনশীল বীজ, দ্রুত বংশবৃদ্ধিকারী হাঁস মুরগী, গরু মোটাতাজাকরন, মাছের ওজন বৃদ্ধি, জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য জৈব সার, জৈব শক্তির ব্যবহার ইত্যাদি সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেও বহু চ্যানেল বিশিষ্ট টেলিভিশন, ভিসি-আর, সেলুলার টেলিফোন, কম্পিউটার, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেট, ফটোকপিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, মূদ্রণ প্রযুক্তি আধিপত্য বিস্তারেও হচ্ছে সহায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

০১. *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জীবন ও রাজনীতি*, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদক মোনায়েম সরকার, বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ.৫৭৫।

০২. মঈদুল হাসান, *মূলধারা'৭১*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৮, পৃ.২১৫।

০৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, *জীবন ও রাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮১।

০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮০

০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৬

০৬. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *রাষ্ট্রচিন্তায় বাংলাদেশ*, কথা প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ৪১

০৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

০৮. মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৬।

০৯. মওদুদ আহমদ, *শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, অনুবাদ জগলুল আলম,২০০২, পৃ.২৮২।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৬।

১১. *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জীবন ও রাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৭।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৭।

১৩. মওদুদ আহমদ, *গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ*, অনুবাদ জগলুল আলম, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০, পৃ.১৩।

১৪. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ*, 'শেখ মুজিবের অঙ্গীকার', অন্যপ্রকাশ, ২০০০, পৃ.৪৯।

১৫. আবুল কাসেম ফজলুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৪

১৬. মওদুদ আহমদ, পূর্বোক্ত,পৃ. ১৫।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

১৮. পূর্বোক্ত,পৃ. ২৩।

১৯. আবুল কাসেম ফজলুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৬।

২০. পূর্বোক্ত, পৃ.৪৯।

২১. মওদুদ আহমদ, পূর্বোক্ত,পৃ. ৪৬।

২২. এমাজ উদ্দিন আহমদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতি*, জ্ঞান বিতরণী, ২০০১,পৃ.১০০।

২৩. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ.৭১।

২৪. পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের সংস্কৃতি চিন্তার ধারা ও স্বরূপ

ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত সময়ে বাঙালি লেখকরা পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তার পরিবর্তে ভাষা-সংস্কৃতিভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ গণতন্ত্র ও প্রগতিশীল চিন্তাধারায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। স্বল্প ব্যতিক্রম ছাড়া, চিন্তার এই ঐতিহ্যগত ভিত্তির উপর ভর করেই স্বাধীন বাংলাদেশের চিন্তাবিদরা তাঁদের চিন্তা চেতনাকে এগিয়ে নিয়েছেন। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র বাঙালী জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক হওয়ায় তাঁদের চিন্তা চেতনায় বাঙালী সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। এই সময়-পরিসরে বাংলাদেশের মানুষের মন-মানসিকতার উপরও উক্ত চেতনার অনিবার্য প্রভাব পড়েছে। কিন্তু সে প্রভাব সমাজ জীবনে ঘণীভূত হবার পূর্বেই রাষ্ট্রের মূল স্তম্ভগুলোতে আঘাত লাগে, ফলে চিন্তা চেতনাগুলো থিতিয়ে না গিয়ে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিবেচনাধীন সময়-পরিসরে (১৯৭২-২০০০) বাংলাদেশের চিন্তাবিদদের লেখায় সংস্কৃতি বিষয়ে যে ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে তার স্বরূপ অনুসন্ধান করা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের লেখকদের চিন্তায় রয়েছে বহুমাত্রিকতা (Dividation)। এই বহুমাত্রিকতা মূলত আদর্শগত। আদর্শিক ভিন্নতার কারণে লেখকদের চিন্তা-চেতনায় সংস্কৃতি ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। অনেকে "যুদ্ধোত্তর কালেও বহুলাংশে পাকিস্তান আমলের মানসিকতা দ্বারা চালিত হয়েছেন।"[১] তাছাড়া পাকিস্তান আমলেও ঐতিহ্য মূল্যবোধ, আধুনিকতা, পুনর্জাগরণ, রেনেসাঁ ইত্যাদি ধারাণাগুলো লেখকদের চিন্তায় বারবার নানাভাবে বক্তব্য ও রীতির নানা পার্থক্যের মধ্য দিয়ে ঘুরে ফিরে এসেছে। সেসময় সংস্কৃতির ভিত্তিমূলে কেউ কেউ ধর্মকে, কেউ কেউ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে হাজার বছরের বাঙালি সমাজের ভাষা ও ঐতিহ্যের কতটুকু গ্রহনযোগ্য আর কতটুকু পরিত্যাজ্য তা নিয়েও ছিল মতান্তর। বাংলাদেশ কালেও তার রেশ ছিল। আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে এই সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা একসময় রূপান্তরিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এই বিভিন্নতার ধরণকে আলোচনার সুবিধার্থে মোটা দাগে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।

১. ঐতিহ্যগত ধারা

২. উদারনৈতিক ধারা

৩. সমাজতান্ত্রিক ধারা

১.ঐতিহ্যগত ধারা

সাতচল্লিশোত্তর পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীরা বাঙালি না মুসলমান, তা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন। তাঁদের চিন্তা-চেতনায় ও সাহিত্য-কর্মের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। বায়ান্ন থেকে সত্তর পেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশেও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। বৃটিশ ভারতের মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারাবাহিকতাবোধের ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হননি। এঁদের কারও কারও চিন্তায় স্ববিরোধিতা দেখা যায়, আবার কেউ কেউ খুবই স্পষ্ট ও স্বাতন্ত্র্যবাদী । চিন্তায় একই রকম না হলেও এঁদের চিন্তাধারার মূলে ইসলামী ঐতিহ্য চেতনা প্রবহমান। তাঁদের মধ্যে নির্বাচিত তিন জনের সংস্কৃতি চিন্তার পরিচয় দেয়া হল।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)

আবুল মনসুর আহমদ একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি আইন ব্যবসাও করেছেন বিভিন্ন সময়ে। বিভাগপূর্ব বাংলা থেকে বাংলাদেশ সময় পর্যন্ত তিনি চিন্তাচর্চা করেছেন। তাঁর চিন্তার মানসিক ভিত্তি তৈরী হয়েছিল ত্রিশ-চল্লিশের দশকেই। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের কালের প্রভাব ছাড়াও আবুল মনসুর আহমদের সংস্কৃতি চিন্তাধারায় দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রতিফলন ঘটেছে। ধর্মীয় দিক থেকে তিনি আহলে হাদিস ধারার ছিলেন। ১৮৯৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মংয়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার ধানীখোলা গ্রামের এক কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। পারিবারিক জীবন ছিল তাঁর রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীলতাই সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে তাঁকে স্বাতন্ত্র্যবাদী করেছে। এ কথা যেমন সত্য তেমনি আরেকটি সত্যের পরিচয় পাওয়া যায় সমাজদেহের দিকে তাকালে যা তাঁর নিজের

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায়- "সমাজব্যবস্থার দরুণ হিন্দু সাহিত্যিকরা মুসলমান চরিত্র লইয়া গল্প উপন্যাস লিখতে পারেনা বলিয়া আমি যে এতদিন তাঁদেরে ক্ষমা করিয়া আসিতেছিলাম, সে ধারণা আমার ঠিক নয়। আমাদের প্রতি ঘৃণা-অবজ্ঞাই এ অবহেলার কারণ।"[২] '১৯৪৪ সালের ৫ মে 'পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির' উদ্যোগে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে আয়োজিত 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলনীতে' মূল সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন,"রাজনীতিকের বিচারে পাকিস্তানের অর্থ যাই হোক না কেন, সাহিত্যের কাছে তার অর্থ তমদ্দুনী আজাদী, সাংস্কৃতিক স্বরাজ, কালচ্যারাল অটনমি।...রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান আলাদা জাতি কিনা, তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে; কিন্তু সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তারা যে আলাদা জাত, এতে কোন তর্কের জায়গা নেই।"[৩] এর ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি আরও বলেছেন "...জীবে জীবে জাতিতে জাতিতে এমন কি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিলটা সত্য নয়, গরমিলটাই সত্য। কারণ এটাই সত্তা। এটুকু দিয়েই এককে অন্য থেকে আলাদা চেনা যায়।"[৪] ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ আবুল মনসুর আহমেদকে আশান্বিত করেছিল। তিনি ভেবেছিলেন দেশ বিভাগ পূর্ব বাংলায় সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সহায়ক হবে কিন্তু সেসময় অতিক্রান্ত হয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কতগুলো সাংস্কৃতিক মতানৈক্য নিয়ে। তিনি তখনও তাঁর নিজস্ব মতের উপর আস্থাশীল থেকেছেন। তখনও ভাবতে চাননি অথবা আদর্শিক কারণে মেনে নিতে পারেননি যে, "বাঙালীর ইতিহাস একটা বিশেষ রূপ নিয়েছে আমাদের এই ভূখন্ডে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এর মধ্যে। ইতিহাসের সে বিশেষ রূপই ধরা পড়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে। এই নতুন জাতিসত্তার সূচনা ১৯৫২ তে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ভাষাপ্রীতি, আত্মত্যাগ, জাতিগত ঐক্যবোধের মধ্য দিয়ে। ১৯৫২ তে যার সূচনা ১৯৭১ এ তার প্রতিষ্ঠা। আমাদের নতুন রাষ্ট্রিয় পরিচয়ের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে আছে আমাদের জাতিগত পরিচয়।"[৫] তিনি ঐতিহ্যে বিশ্বাস করেন কিন্তু ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় যে বিশেষ সময়ের নতুন বাঁক, যা গতিপথ বদলে দেয় তাকে মানতে চাননা। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরেও তিনি বলেছেন, "শেরে বাংলা ফজলুল হক যা শুরু করিয়াছিলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তা সমাপ্ত করিয়াছেন। (শেরে বাংলা হতে বঙ্গবন্ধু,ঢাকা,১৯৭৩ পৃ০১)"[৬] এই একই ধরনের কথা 'বেশী দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা', 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' বইতে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁর তত্ত্ব হল- "বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তান ভাংগে নাই, দ্বিজাতিতত্ত্বও মিথ্যা হয় নাই। এক পাকিস্তানের জায়গায় লাহোর প্রস্তাবমত দুই পাকিস্তান হইয়াছে। ভারত সরকার লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। দুই রাষ্ট্রের নামই পাকিস্তান হয় নাই, তাতেও বিভ্রান্তির কারণ নাই। লাহের প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটার উল্লেখ নাই, শুধু মুসলিম মেজরিটি রাষ্ট্রের উল্লেখ আছে। তার মানে রাষ্ট্র নাম পরে জনগণের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়ার কথা। পশ্চিমা জনগণ তাদের রাষ্ট্রের নাম রাখিয়াছেন 'পাকিস্তান'। আমরা পূরবীরা রাখিয়াছি বাংলাদেশ। এতে বিভ্রান্তির কোনও কারণ নাই।"[৭] এ সম্পর্কে আনিসুজ্জামান প্রশ্ন তুলেছেন, "...কিন্তু লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার একত্রিশ বছর পরে ইংরেজ শাসনের অবসান ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার চব্বিশ বছর পরে ভারত সরকার এবং সেদেশের কংগ্রেস দল কেন লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য এত ব্যগ্র হয়ে উঠল, আবুল মনসুর আহমদ তার কোন ব্যাখ্যা দেননি। তাছাড়া আবুল মনসুর আহমদ যে কথা বলেনি, তা এই যে, লাহোর প্রস্তাবে যে পূর্ব পাকিস্তানের কল্পনা করা হয়েছিল, তার মানচিত্র আর ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মানচিত্র এক নয়; ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের যে ধারাবাহিকতা, যে ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ; আর মুক্তিযুদ্ধের বীজ উপ্ত হয়েছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে, ১৯৪০ এর লাহোর প্রস্তাবে নয়। এত মানুষ প্রাণ দিয়েছে, এত নারীর সম্ভ্রম হারিয়েছে কেবল লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়নের জন্য এ কথা বড় নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মতো শোনায়।"[৮]

মনসুর আহমদ নিজেকে বাঙালি বলেছেন। তার বাঙালিত্বে ১৯৪০ এর দশকে গড়ে ওঠা দ্বিজাতিতত্ত্বের স্পর্শ লাগলেও মধ্যবর্তী দশকগুলোর অভিঘাত এসে পৌঁছেনি। তিনি মানসভূমিতে রয়ে গেছেন বিভাগপূর্ব বাংলায় আর প্রতিনিধিত্ব করেছেন বিভাগোত্তর কালের পথ ধরে স্বাধীন বাংলায়, এই দুই দ্বন্দ্বে তিনি সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। এই সীমারেখায় পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে নামের পার্থক্যটাই শুধু দেখেছেন আর নতুন রাষ্ট্রের সত্তাকে পূর্বের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবতেই পারেননি যা পরবর্তীতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল মনসুর আহমদের সংস্কৃতি চিন্তায় ও তাঁর রাজনৈতিক ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর সংস্কৃতি চিন্তায় রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যা তাঁকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। সে স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি পূর্ব বাংলার মুসলমানের বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য। মুসলমানি সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-ই হবে বাংলাদেশের সংস্কৃতির ভিত্তি। তাই তাঁর সংস্কৃতি চিন্তা "মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গ' কেন্দ্রিক। একজন বাঙালি ও একজন মুসলমান মনের যুগপৎ সমন্বয়ে তিনি একজন 'খাঁটি বাঙালি মুসলমান।"[৯] তাঁর সংস্কৃতি চিন্তার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝবার জন্য এই মানস-গঠন সহায়ক। সংস্কৃতিকে তিনি কালচার বলেই গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তিক ও জাতীয় পর্যায়ে কালচারের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর ধারণা যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তা হলো–

"ব্যষ্টি বা ইন্ডিভিজুয়ালের যা ব্যক্তিত্ব বা পার্সন্যালিটি','সমষ্টি বা কমিউনিটির তা-ই কালচার'।...সকল লোক সমষ্টিরই অর্থাৎ সব কমিউনিটি সমাজ বা জাতিরই একটা নিজস্ব সমবেত ব্যক্তিত্ব বা কর্পোরেট পার্সন্যালিটি আছে। তারই নাম ঐ লোক সমষ্টি বা কমিউনিটির কালচার।

"...জাতি বা ন্যাশন শব্দটা ইদানিং বেশীর ভাগ রাষ্ট্রীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নৃতাত্ত্বিক এথনিক্যাল বা র‍্যাশিয়াল অর্থে ততটা নয়। ধর্মীয় অর্থে ত নয়ই। একটি রাষ্ট্রের সব নাগরিক মিলেই ন্যাশন বা রাষ্ট্রীয় জাতি, নৃতত্ত্ব জাতি বা ন্যাশন, যদিও নৃতত্ত্ব ধর্ম ও ভাষার দিক হতে আমরা এক নই। অপর দিকে রাষ্ট্রের নাগরিক না হলে নৃতত্ত্ব ধর্ম ও ভাষার দিক হতে একগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের লোক হয়েও এক ন্যাশন হয় না।

....কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় জাতির পার্সন্যালিটি অর্থাৎ কালচার এক নাও হইতে পারে। একই ন্যাশনের ভিতরে একাধিক ন্যাশনালিটি থাকিতে পারে। তৎকালীন যেমন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা একই রাষ্ট্রীয় ন্যাশনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও পৃথক ও স্বতন্ত্র ন্যাশনালিটি এবং পৃথক ও স্বতন্ত্র কর্পোরেট পার্সন্যালিটির অধিকারী ছিল। দুই অঞ্চলের কালচারও তাই স্বতন্ত্র ছিল।" তিনি আরও বলেছেন– "বাংলাদেশ আজ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই হিসেবে তার একটা জাতীয় ব্যক্তিত্ব ও সত্তা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই সঙ্গে তার একটা জাতীয় আত্মাও আছে কি? রাষ্ট্রীয় সত্তায় আমরা একটা নেশন। আমাদের রাষ্ট্র নেশন স্টেট। কিন্তু এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয়, দৈহিক বর্ণনা, বস্তুগত পরিচিতি। এই পরিচয়ের বাহিরে এই পরিচিতির উর্ধ্বেও এই সত্তার গভীরে একটা আধ্যাত্মিক, স্পিরিচুয়াল, অস্তিত্ব আছে কি? তার মানে আমাদের একটা জাতীয় আত্মা আছে কি?"[১০]

এই জাতীয় আত্মার পরিচয় তিনি স্পিরিচুয়াল কনসেপশনে বুঝাতে গিয়ে বলেছেন– "স্পিরিচুয়াল হইলেও জাতীয় আত্মা ধর্মীয় আত্মা হইতে পৃথক। ধর্মীয় আত্মা ও জাতীয় আত্মা

Dhaka University Institutional Repository

দুটোই সিম্বলিক হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য মৌলিক রয়েছে। একটা আত্মিক অপরটা দৈহিক। একটা ইন-অর্গানিক, অপরটা অর্গানিক। একটা সত্যনিষ্ঠ অপরটা বস্তুনিষ্ঠ। একটা হৃদয়ের, অপরটা মস্তিস্কের।" [১১]

এই আইডিয়ালিজম , ইন অর্গানিক ও হৃদয়ের ব্যাপারটিকে তিনি কালচারের উৎস মনে করেন যা ধর্ম ভিত্তিক। যার জন্য তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কালচার গড়ে না ওঠার জন্য কোন রাজনৈতিক কারণকে দায়ী করেননি। তিনি বলেছেন:

"...রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছাড়া মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় কালচার গড়িয়া উঠিতে পারে নাই এবং সেই কারনে বাঙ্গালীদের কোনও জাতীয় কালচার নাই, ব্যাপারটা তা নয়। বাংলার জাতীয় কালচার গড়িয়া না উঠার কারণ রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা নয়, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা।"[১২]

এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকে তিনি হিন্দু ও মুসলিম সমাজের বিভিন্ন রীতি-নীতি, আচার-আচরণের পার্থক্যের মধ্যে দেখেছেন এবং বলেছেন– "এই দুইটা সমাজে দুইটা প্যারালেল কালচার গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতীয় কালচার গড়িয়া উঠে নাই। বাংলা ভাগের মধ্যে দুইটা কালচার নিজ নিজ আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইয়াছে।"[১৩]

তাই তিনি বলেছেন– "ধর্মোৎসবই সকল জাতির কৃষ্টিজীবনের সবচেয়ে প্রশস্ত ও উর্বর ক্ষেত্র।"[১৪] "এবং এই ধর্মোৎসবের বিকাশ ও বিস্তৃতিই কালচারের ইনফ্রাস্ট্রাকচার।"[১৫] কারণ তার মধ্য দিয়েই সমবেত মন বিকশিত হয়। কালচারের স্ট্রাকচারে যদি শক্ত মাটির ভিত না থাকে তবে শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসবের আনন্দ সাগরে ডুব দিয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচর খোঁজা একটি মাত্র খুঁটিকেই আকড়ে ধরা ছাড়া কিছু নয়। আবুল মুনসুর আহমদের চিন্তায় বিশিষ্টতা আছে। সমবেত জাতীয় সংস্কৃতির ধারণা আছে কিন্তু তার সাথে সাথেই বিকশিত হয়েছে একটি সঙ্কীর্ণ ধারা যা মুক্ত নয় দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা থেকে। এজন্যই রবীন্দ্র বিতর্কে তিনি সরকারী নীতির সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলামকে শুধুমাত্র কৃষ্টিক ঐতিহ্যের কারণে জাতীয় কবি মেনে নিয়েছেন। ভাষা চিন্তায়ও তিনি নির্ভর করেছেন বাঙালি জাতির আদিম রক্তধারায়। তিনি মনে করেন, আর্য জাতির প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে এদেশে দ্রাবিড়রা বাস করত। তারা সেমেটিক বংশজাত। সেই কারণেই এদেশে ভাষা সংস্কৃতিতে আরবী-ফারসীর প্রভাব বেশী

Dhaka University Institutional Repository

পড়েছে। তাঁর ভাষা চিন্তায়ও সেই ঐতিহ্য কীভাবে সংস্কৃতির বাহন হতে পারে তার রূপরেখা নির্ধারণ করেছেন।

"...গোশত আন্ডা ও পানির মধ্যে 'ইসলামত্ব' নাই বটে, কিন্তু 'মুসলমানত্ব' আছে। ...বহু যুগের ব্যবহারে শব্দগুলি তাই এক একটা কালচারেল আইডেনটিটি বা কৃষ্টিক শেনাখ্তি পাইয়া গিয়াছে। সোজা কথায় একটা হিন্দুর মুখের কথা অপরটা মুসলমানদের মুখের কথা, এই তাদের পরিচয়। সুতরাং আমারা যদি 'পানি' ছাড়িয়া 'জল' 'ধরি' তবে আমরা ধর্মচ্যুত হইবনা সত্য কিন্তু ঐতিহ্যচ্যুত হইব নিশ্চয়ই।"[১৬]

তিনি আসলে ধর্ম ও সংস্কৃতিকে এক মনে না করলেও, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্নও মনে করেননি। তাই তাঁর মন্তব্য-

"...যাঁরা অতীতে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতিকে ভেঙ্গেচুরে এক করতে চেয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যের সাধুতায় শ্রদ্ধা জানিয়েও আমরা বলতে বাধ্য; তাঁরা ঠিক কাজ করেননি। ঠিক কাজ করেননি এই জন্য যে, তাঁরা চেয়েছেন এই উভয় সংস্কৃতিকে তাদের প্রাণ ধর্ম বা ফান্ডামেন্টাল থেকে বিচ্যুত করতে।...ভারতীয় মনীষা তাকে নিজের ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই আজ পাকিস্তানবাদের উদ্ভব হয়েছে।"[১৭]

"তিনি এমন এক সংস্কৃতির কথা বলতেন 'যা একদিকে মুসলমানী অন্যদিকে বাঙালী, এই সংস্কৃতি মুসলমানের অবশ্যই, কিন্তু তাই বলে অবাঙালীদের সংস্কৃতি নয়; অন্য দিকে তা বাঙালী হয়েও মুসলমানী বটে।"[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)

আবুল ফজল বিভাগ পূর্ব কাল থেকে আশির দশক পর্যন্ত চিন্তা-চর্চায় সক্রিয় ছিলেন। এই পথপরিক্রমায় তিনি সাহিত্য ও সমাজের ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, ধর্মীয় গোড়ামীর মত যতরকম অশুভশক্তি আছে, তার মূলে সবেগে কখনও কখনও প্রবল বেগে নাড়া দিয়েছেন। শুধু তাই নয়; "তিনি সমাজ-সচেতন সাহসী বুদ্ধিজীবী, জাতির বিবেক। বিবেকবান সচেতন নির্ভীক কর্মী হয়ে চলমান সমাজ বাস্তবতায় প্রতিবাদ, প্রতিরোধে ভীত বা কুণ্ঠিত হননি। 'তিনি ছিলেন সমাজ সচেতন, উদার মানবতাবাদী সৎ ও সাহসী বুদ্ধিজীবী।"[১৯] যে কোন রাজনৈতিক-সামাজিক সাংস্কৃতিক সংকট মূহুর্তে তিনি দেশ জাতির স্বার্থে ন্যায়ের পক্ষে, দেশের মুক্তির পক্ষে কলম ধরেছেন। শুধু তাই নয়, অমিত বিক্রম বীরের ন্যায় রাজপথে নেমেছেন। আবুল ফজলের এই উদার মানবতাবাদের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল বিভাগ পূর্বকালে। " 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে। বিশ শতকে অচলায়তন বাঙালী মুসলমানের মধ্যে মুক্তবুদ্ধি, অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল চেতনা ও মূল্যবোধের উদ্বোধন ঘটানোর জন্য আবুল হোসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), কাজী আব্দুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), কাজী মোতাহার হোসেন (১৯৯৭-১৯৮১, আব্দুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪), মোতাহের হোসেন চৌধুরীর (১৯০৩-১৯৬৫) সাথে তিনিও এগিয়ে এসেছিলেন। 'মুসলমান সাহিত্য সমাজ' এর 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সংগঠক ও অন্যতম রূপকার হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং শিখা পত্রিকার সম্পাদনা (১৯৩১) আবুল ফজলের মনোজাগতিক পালাবদলে পালন করেছিল অনুঘটকের ভূমিকা।"[২০]

"শিল্পী জীবনের শুরু থেকেই আবুল ফজল আদর্শপ্রাণ; সে আদর্শপ্রাণতাই পাকিস্তানোত্তর কালে একটা বিশিষ্ট পরিণতিতে উন্নীত।"[২১] "তবে পাকিস্তানের জন্মলগ্নে তাঁর মনে ক্ষীণ প্রত্যাশা জেগেছিল বলেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর (১৮৭৬-১৯৪৮) মধ্যে একজন মানবতন্ত্রীকে আবিস্কার করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মানবতার অপমান, অবমাননা, অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁকে কলম তুলে নিতে হয়। 'আবুল ফজলের সমগ্র সৃষ্টিকর্মকেই যে আদর্শের মূর্তরূপ বলে আখ্যায়িত করা চলে সেটি তাঁর নিজস্ব অভিধায় 'মানবতন্ত্র'। রাজনৈতিক পরিভাষায় যার নাম 'উদার মানবিকতাবাদ।"[২২] তাঁর সে, বিবেকী

Dhaka University Institutional Repository

তাড়নাজাত সাহস-ই তাঁকে দিয়ে মানবতাবাদের গান গাইয়েছে। এই মানবতাবাদের জয়গান গাইতে গিয়ে তাঁকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়েছে, সরকারের সাথে কখনও আপোষ করতে হয়েছে আবার মতান্তরও হয়েছে সরকারের সাথে, সবকিছু মিলেই তাঁর 'মানবতাবাদ'। 'সাহিত্যের পথ ও সাধনা' নামক প্রবন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন:

"সাহিত্যকে আমি কোনদিন বিলাসের বস্তু মনে করিনি। মানুষের জীবনে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাহিত্যের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। সে ভূমিকা সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম। তাই দেশের মানুষ ও সমাজের সমস্যা বার বার আমার লেখায় ছায়াপাত করেছে। ভয়ে বা প্রলোভনে আমি কখনো আমার কথাকে সাহিত্যের তথা সত্যের পথ থেকে বিপথগামী হতে দেইনি। দেশ ও সমাজের কথা ভেবে যখনই আমার মন আলোড়িত হয়েছে তখন আমি তা নির্ভয়ে প্রকাশ করেছি- আমার কণ্ঠস্বর কখনো চাপা থাকেনি। চেষ্টা করেছি লেখায় যথাসম্ভব যুক্তি ও বুদ্ধি-নির্ভর হতে।"[২৩]

একারণেই ষাটের দশকের মাঝামাঝি "সঙ্কটের দিনে তাঁর চিন্তা দেশের বিবেকের কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছে।"[২৪] তারও পাঁচ বছর পরে স্বৈরাচারী দশকে তিনি আরো উচ্চকণ্ঠী সৎসাহসী হয়ে ওঠেন। তাঁর সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কিত চিন্তাধারা ঐ সময়েই বিকশিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি নতুন করে আর সংস্কৃতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেননি। তবে এ সময়ের চিন্তার সাথে যুক্ত হয়েছে সমাজ রাষ্ট্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক প্রসঙ্গ ও বিবেচনা যা তাঁর সংস্কৃতি চিন্তার-ই বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। আবুল ফজল সংস্কৃতি বলতে বোঝেন, সৌন্দর্য ও মহত্বের সাধনাকে। আর শব্দটির শাব্দিক অর্থ বলতে বোঝেন 'কর্ষণা' বা 'চাষ করা'কে। তিনি 'মন'কে জমির সাথে তুলনা করেছেন। 'মনের ফসল পেতে হলে' তাকে কর্ষণ করতে হয়। 'কর্ষণ' না করলে মনের ফসল ভাল পাওয়া সম্ভব নয়। যাকে সংস্কৃতি বলা হয় তার লক্ষ্য আসলে 'মন আর চরিত্রের' উৎকর্ষ সাধন করা। এক্ষেত্রে তিনি ধর্মের প্রসঙ্গও তুলনামূলক বিচার করে দেখেছেন। যারা ধর্মের মধ্য দিয়ে চরিত্রের উৎকর্ষে বিশ্বাসী তারাও একরকম সংস্কৃতিচর্চা করেন। সেজন্য তিনি মনে করেন "ধর্ম-কর্মও এক রকম সংস্কৃতিচর্চা।"[২৫] পার্থক্য শুধু যারা ধর্মের মধ্য দিয়ে মন ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করতে চান, তারা 'ধর্মীয় বিশ্বাস' আর 'অনুষ্ঠান' দ্বারা মনের জমি ভালভাবে কর্ষণ করেন আর যারা সংস্কৃতিচর্চা করেন তাদের হাতিয়ার হল সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্য ইত্যাদি। উভয়েরই লক্ষ্য মন ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন। মনের সাথে সম্পর্ক না থাকলে উভয়েরই উদ্দেশ্য যান্ত্রিক হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়,'সাংস্কৃতিক জীবনের' মধ্যেই সংস্কৃতির সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। এই সাংস্কৃতিক জীবন বলতে তিনি বোঝেন "সুন্দর ও শোভন জীবন- যার মন মানসের পুরোপুরি বিকাশ ঘটেছে একমাত্র সেই হতে পারে এমন জীবনের অধীকারী।"[২৬] মন মানসের বিকাশের জন্য তিনি সহজাত সুপ্ত গুণগুলোকে বিকশিত করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনে যুক্ত থাকায় তাঁর চিন্তায় মোতাহের হোসেন চৌধুরীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতি চিন্তায় তিনি ব্যক্তির বিকাশকে বড় করে দেখেছেন। ব্যক্তির বিকাশে তিনি 'ধর্মগত' 'দেশগত' বা সম্প্রদায়গত মত, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও শিক্ষার প্রচলিত উচ্চতম ডিগ্রী কে নয় বরং এগুলোর নানা বৈচিত্র্য ও পার্থক্য সত্ত্বেও ব্যক্তি যদি 'অসভ্য' 'বর্বর' 'পাষন্ড' না হয় তবেই তাকে সংস্কৃতিবান বলে অভিহিত করেছেন। ব্যক্তির বিকাশকে তিনি বিশেষভাবে বিবেচনায় এনেছেন। ব্যক্তির এই বিকাশের জন্য তিনি কোন দেশের পরাধীনতাকে অন্তরায় মনে করেননি, তবে স্বাধীনতাকে সহায়ক বিবেচনা করেছেন। একটি উদাহরণে তা পরিস্কার করা যায়:

"তবে স্বাধীনতা যে সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক জীবনের সহায়ক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং সাংস্কৃতিক জীবনযাপনের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপরিহার্য। কারণ সভ্যতা বা সংস্কৃতি সৃষ্টি করে ব্যক্তি আর রুচিবান সুন্দরচিত্ত মানুষেরই প্রভাবে গড়ে উঠে সংস্কৃতি।...কিন্তু ব্যক্তি মনের উৎকর্ষের উপরই নির্ভর করছে সংস্কৃতি, এখানে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করলে ফল বিপরীত হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।"[২৭]

ব্যক্তির সচেতন সাধনার দ্বারা 'আত্মসৃষ্টি'কেই 'সংস্কৃতির বুনিয়াদ' বলেছেন তিনি। এটি 'প্রাকৃতিক ব্যাপার' নয় বলেই ব্যক্তিকে 'গ্রহণ ও সমঝদারি' গুণের অধিকারী হতে হবে। এর জন্য 'প্রতিভার দরকার হয়না। বড় বড় কবি সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিকদের সৃষ্টিকে আত্মস্থ করেই সংস্কৃতিবান হওয়া সম্ভব। তার জন্য ব্যক্তির দুটি সহায়ক গুণ হলো 'মূল্যবোধ' ও 'যুক্তিবিচার'। এই দুই ভিত্তির উপর নির্ভর করে মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য সাধনা। এই মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের সীমা পরিসীমা নির্ধারণ করা কঠিন তবে স্থুল প্রয়োজনের বাইরে তার অবস্থান। স্থুল প্রয়োজনের দিকটা বড় হয়ে উঠলে সাংস্কৃতিক সংকট দেখা দেয়। তাই তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন;

Dhaka University Institutional Repository

"প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে না পারলে তা পদ্মবনে মত্ত হস্তীর মতই জীবনের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য সাধনাকে দলিত মথিত করে দেয়। ফলে প্রয়োজন হয়ে উঠে জীবন, তখন মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য চর্চাকে মনে হয় বিলাস। ...মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য সাধনাকে যাঁরা ফাঁকা বিলাস বলে বিদ্রূপ করেন তাঁরা ভুলে যান যে এ বিলাসই সভ্যতা বা সংস্কৃতি।"[২৮]

কোন জাতির 'সৌন্দর্য' ও 'মহত্ত্ব' সাধনার স্বরূপই সে জাতির জাতীয় সংস্কৃতি। "জাতিকে জাতি করে তার সংস্কৃতি- সংস্কৃতিতেই তার পরিচয় তার যা কিছু স্বাতন্ত্র্য আর বৈশিষ্ট্য।"[২৯] জাতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ বোঝা যায়, জাতির মননশীলতার বিকাশের উপর। রাজনীতি তার 'বাইরের খোলস।' সংস্কৃতি মানুষকে 'মনুষ্যত্বসচেতন' আর রাজনীতি মানুষকে ক্ষমতাসচেতন করে তোলে। গণমানুষের জীবনে তার প্রভাব পড়ে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মূলনীতি সমাজতান্ত্রিক হওয়ায় তিনি সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির 'বিকাশ' চেয়েছেন। এ সংস্কৃতি গণমুখী জীবন ও জীবিকাঘনিষ্ঠ হওয়ায় বুর্জোয়া সংস্কৃতি নয়, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ চেয়েছেন। কারণ তিনি মনে করেন "জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির আয়ুপ্রায় নিঃশেষিত।"[৩০]

বাংলাদেশের সমসাময়িক অবস্থা বিবেচনা করে তিনি সরাসরি গণতন্ত্রের পথ ধরে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে অনেক বাধা লক্ষ্য করেছেন। গণতন্ত্র যেহেতু 'সাধনাসাপেক্ষ' ব্যাপার তাছাড়া 'দীর্ঘদিনের সংস্কার' কে মন থেকে মুছে ফেলা যেহেতু সম্ভব নয়, সেজন্য দল-মত নির্বিশেষে পরমতসহিষ্ণু হওয়ার আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করেছেন। একই সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে তিনি সমাজতান্ত্রিক দেশের সাথে হাত মেলাতে চান কিন্তু তিনি কোন শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলেননি। তাঁর সমাজতন্ত্রী মনোভাব ও 'মুক্তবুদ্ধি' সম্পর্কে মুহম্মদ এনামুল হক, আব্দুল কাদির, যতীন সরকার ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। এঁদের মধ্যে মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর সাহিত্য প্রেরণার মূল উৎস "ইসলাম ধর্ম'কে"[৩১] চিহ্নিত করেছেন। আবুল ফজল নিজেও লেখকের রোজনামচা গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন এভাবে- "মুখে বা কলমে আমি যাই বলি বা লিখি না কেন, মনে হয়, আমার ভিতরেও একটা ধর্ম-চেতনা ফল্গুধারার মতো নীরবে প্রবাহিত রয়েছে। এ ব্যাপারে আমার মধ্যেও স্ববিরোধিতার অন্ত নেই।"[৩২] তাঁর সংস্কৃতিচর্চা সম্পর্কে সিরাজুল

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম চৌধুরীর মতটি বিবেচনা করা যায়- "সংস্কৃতি বলতে মানুষের সঙ্গে তার পরিবেশের দ্বন্দ্বের শিল্পগত প্রকাশকে অবশ্যই বোঝেননি তিনি, সংস্কৃতি বলতে উপভোগ, অবকাশ, উৎকর্ষ ইত্যাদিকেই বুঝিয়েছেন। ...তাঁর সমাজতন্ত্র কল্পলোকের, একথা বলা যাবে; কিন্তু সমাজতান্ত্রিক জগৎ গড়ে তোলার আবশ্যকতার বিষয়ে তিনি যে অসন্দিগ্ধ সে কথা মানতেই হবে।"[৩৩]

এই সমাজতান্ত্রিক জগৎ কে 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' বলা যায়। কারণ তাঁর মানসজগতের দ্বন্দ্ব-ই হয়ত শেষ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখায় মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করবার ও সময়োপযোগী উপায় নির্ধারণে ব্যর্থ করেছে। তাঁর মানস গঠন সম্পর্কে আলাউদ্দিন আল আজাদ তাই মন্তব্য করেছেন :

"...আবুল ফজলের প্রাথমিক মানস গঠনে দুই বিপরীতধর্মী উপাদান লক্ষ্য করা যায়। যার প্রথমটির উদগাতা তাঁর পরহেজগার ইমাম পিতা এবং দ্বিতীয়টির, প্রিয়সখা দিদারুল আলম। আবুল ফজল বামপন্থী ছিলেন না, নাস্তিকও নয় বরং ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন; একে পারিবারিক উত্তরাধিকার বললে সম্ভবত ভুল হবে না।"[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)

সৈয়দ আলী আহসান সংস্কৃতি বলতে বুঝতেন "দেশ ও জাতির ঐতিহ্য ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা এবং নিজস্ব শিল্প সাধনাকে আবিস্কার ও তার চর্চা।"[৩৫] সংস্কৃতির এই স্বাতন্ত্র্য তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতির চেতনার পরিচায়ক। তিনি বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করে জাতিসত্তা নির্ণয় করেছেন। এবং জাতিসত্তায় ও সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ, ইসলাম ও হিন্দুধর্মের প্রভাবকে যৌক্তিকভাবে তিনি স্বীকার করেছেন। পালপূর্ব যুগকে তিনি বিবেচনায় আনেননি। সংস্কৃতি নির্মাণে পালদের তিনি প্রথমে বিবেচনায় ধরেছেন। পালরা ছিলেন বঙ্গদেশবাসী বৌদ্ধ আর সেনরা ছিলেন বহিরাগত। তারা কর্ণাটক থেকে এসেছিলেন। পাল শাসনামলে সুসংহত ভৌগোলিক সীমারেখা ছিল বঙ্গ ভূমির। সে সময় সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সমাজে প্রজ্ঞা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই সাংস্কৃতিক বিকাশ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। পাল রাজত্বে জাতিভেদের প্রতাপ ছিল না। পরে সেন রাজবংশ এ ভূখন্ড শাসন করলেও তাদের অল্প দিনের শাসন এ অঞ্চলে শক্ত ভীত গড়তে পারেনি। তাদের বর্ণাশ্রম প্রথা প্রবল প্রতাপে আত্মপ্রকাশ করলেও বঙ্গবাসী সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। 'বর্ণাশ্রম ধর্মের আনুকূল্যে সেজন্য যে সমস্ত সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ গড়ে উঠেছিল সেগুলোর প্রায় সবটাই ছিল পশ্চিম বঙ্গে' সেটিও অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ। তাই তিনি বাংলাদেশের জাতিসত্তা নির্ধারণের ঐতিহাসিক সূত্র অন্বেষণ করে প্রথমেই যাকে চিহ্নিত করেছেন তা হচ্ছে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও চিন্তা। এর পরিচয় তিনি দিয়েছেন: "এই সংস্কৃতি ও চিন্তার মধ্যে যে আবেগগুলো গৃহীত এবং বলিষ্টভাবে উচ্চারিত, তা হচ্ছে, প্রথমত গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য; দ্বিতীয়ত, মানুষে মানুষে সাম্য এবং শ্রেণীবিভেদ রহিত অবস্থা, তৃতীয়ত, মানবতাবোধ এবং পরমত সহিষ্ণুতা; চতুর্থত, যা কিছু সুন্দর এবং কল্যাণকর তা গ্রহণ করার আগ্রহ।"[৩৬]

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল শাসনামলের অবলুপ্তির পর তাঁদের এই স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলো মুসলমান শাসনামলে মুসলমানদের আনীত সংস্কৃতির সাথে মিশে গিয়েছিল। মুসলমান শাসনামলের এ পর্যায়ের বিপুল পরিবর্তনকে তিনি চিহ্নিত করেছেন যেভাবে তা হলো: "ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক অংগনে শ্রেণীভেদ বিলুপ্ত হয়, নতুন দুটি ভাষার স্বভাব এবং বিবেচনার প্রক্রিয়া

Dhaka University Institutional Repository

এদেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে, স্থাপত্য শিল্প নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করে এবং পোশাক পরিচ্ছদ এবং খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতিতে বিপুল পরিবর্তন আসে।"[৩৭]

কিন্তু সাংস্কৃতিক এই ধারাবাহিক সূত্র নির্মাণে তিনি একই প্রবন্ধে এর পরই পাকিস্তান আমলের ভৌগোলিক সত্তা নির্ধারনের প্রকরণগুলোর অসংলগ্নতা নির্ণয় করেছেন। শুধুমাত্র ধর্মীয় ঐক্য ও প্রশাসনিক ঐক্যের মধ্য দিয়ে জাতিসত্তা নির্ধারণ করা যে যায় না, তার ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বাংলাদেশের জাতিসত্তার স্বরূপ নির্ণয়কালে ধারাবাহিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বৃটিশ শাসনামলের কোন প্রভাবের পরিচয় তিনি বাঙালী জীবনে তুলে ধরেননি। ঐতিহ্য অনুসন্ধানকালের ক্ষেত্রে তিনি মুসলিম শাসনামল পর্যন্তই বিবেচনা করেছেন।

তারপর পাকিস্তানী আমলের অবাস্তব ভিত্তির ভাংগন দেখা দেয় ১৯৫২ সালে এবং এই ভাংগনের সূত্র ধরে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বার সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রশ্নে তিনি বলেন, "জাতিগত সত্তা হিসেবে আমরা বাঙালী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলাম এবং দেশগত সত্তা হয়েছিল বাংলাদেশ। সে সময় এ উভয় সত্তার সমন্বয় করা হয়নি। অর্থ্যাৎ আমরা বাঙালী একথাই বলা হয়েছিল, কিন্তু কোন সূত্রে বা রেফারেন্সে বাঙালী সে কথা এখন সুস্পস্টভাবে বলা প্রয়োজন।"[৩৮] এই প্রয়োজনবোধ থেকেই তিনি 'বাঙালী' এবং 'বাংলাদেশী' বিতর্ককে অর্থহীন মনে করেন। তাঁর যুক্তিতে "ভৌগোলিক জাতিসত্তাই আমাদের রক্ষা-কবচ।"[৩৯] ভৌগোলিক সীমানা একটি দেশের স্বাধীনতার চিরস্থায়ী সীমানা নয় এই সীমানার উপর প্রভাব বিস্তারের বিভৎস পরিণতির দৃষ্টান্তও পৃথিবীতে আছে কিন্তু তার পরেও তিনি ভৌগোলিক বেষ্টনীর মধ্যে স্বকীয়তা প্রমাণে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং বাংলাদেশের নির্দিষ্ট ভূখন্ডের মধ্যে জাতিসত্তার ঐতিহ্য প্রকাশে, সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য প্রকাশে যুক্তি তুলে ধরে বলেছেন-

"আমাদের দেশের বাইরেও ভারতবর্ষে একটি প্রধান বাঙালী গোত্র আছে যারা বাঙালী হয়েও সর্বভারতীয় সত্ত্বার মধ্যে বিলীন। আমরা যদি আমাদের দেশগত অস্তিত্বের কথা চিন্তা না করে বাঙ্গালীত্বের কথা বলি তাহলে আমরা নিজেদেরকে সম্প্রসারিত করতে পারব না, বরঞ্চ ভারতের বিরাট আগ্রাসনের সম্ভাবনার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হবো। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হবে আমাদের দেশগত সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে নিজস্ব জাতিসত্ত্বা নির্মাণ করা।"[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

"ইসলামের প্রতি সত্য অন্বেষা তাঁর অনেক রচনার উৎস। তাঁর মন ছিল গোঁড়ামী ও কুসংস্কারমুক্ত। অন্যদিকে উদার আধুনিক জীবন চেতনার সঙ্গে গভীর বিশ্বাস তাঁকে আত্মসমাহিত ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি দিয়েছিল।"[৪১]

কিন্তু তার পরেও তিনি সমালোচনার উর্ধেক্ষ ছিলেন না। তাঁর পান্ডিত্য, যোগ্যতা সম্পর্কে সবাই সচেতন হলেও তিনি প্রশংসিত হওয়ার সাথে সাথে সমালোচিতও হয়েছেন। জাতীয় ও আন্ত র্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং দেশে বিদেশে বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিতও হয়েছেন। তবে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে তিনি পরিহার করেননি কখনও। ঐতিহ্য সচেতনতার সাথেই তিনি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বলয় চিহ্নিত করেছেন। জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৭৭ সালে তিনি মন্ত্রিসভায় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী নিযুক্ত হন। একজন ঐতিহ্যসচেতন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি 'মাদ্রাসা শিক্ষা' ও 'সাধারণ শিক্ষা' ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, "আমি পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করি তখনই আমার কার্যকাল শেষ হয়। এ সম্বন্ধে পরিশীলিত কোন সিদ্ধান্ত আজো হয়নি।',[৪২]

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করবার জন্য পাশ্চাত্য, প্রাচ্য এবং মুসলিম বিশ্বের সাথে সংস্কৃতির আদান প্রদানের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। এবং এর মধ্য দিয়েই তিনি ঐতিহ্যকে নিরূপন করে বেগবান করতে চেয়েছেন। বর্তমান বিশ্বের সাথে অর্থপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করে নিজেদেরকে সমকালীন করবার প্রয়াস পেয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারের নিকট ১৯৮৮ সালে তিনি সাংস্কৃতিক রূপরেখা গঠনের প্রস্তাব দিলে সরকার তাঁকে চেয়ারম্যান করে কমিশন গঠনের ঘোষণা দেয় এবং তিনি ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সংস্কৃতি কমিশনের সভাপতি হিসেবে জাতীয় সাংস্কৃতিক নীতিমালার রিপোর্ট সরকারের নিকট জমা দেন। সামারিক শাসনের পদত্যাগের দাবীতে আন্দোলন এবং একজন সদস্য রিপোর্টের বিরোধিতা করলে শেষ পর্যন্ত রিপোর্টটি বাস্ত বায়নের মুখ দেখেনি। রিপোর্টটি সৈয়দ আলী আহসানের ব্যক্তিগত অভিমতসহ তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করছি:

Dhaka University Institutional Repository

"....বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি নিজস্ব বলয় আছে এবং এই বলয় বাংলাদেশের এলাকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও বিশ্ববোধের সঙ্গে তা যুক্ত। যে নীতিমালা আমরা চিহ্নিত করেছিলাম তা নিম্নরূপ :

১. আমাদের আবহমান ঐতিহ্যের অনুসরণ,জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচেতনার অনুষঙ্গরূপে প্রাপ্ত নৈতিক চেতনাকে সমুন্নত রাখার প্রয়াস।

২. ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত বাংলাদেশের মানুষের মানবতাবোধের সঙ্গে বিশ্ববোধের ঐক্যসাধন।

৩. আমাদের লিখিত-অলিখিত সুদীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাস,ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মহান আদর্শ যাতে জাতীয় জীবনে অবিনশ্বর রূপ লাভ করে তার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. জাতীয় জীবনে সহনশীলতার ভাবধারাকে জোরদার করে কার্যকর গণতান্ত্রিকবোধের বিকাশ সাধন, বিদেশী সংস্কৃতির সংস্কৃতি গ্রহণ ও অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।

৫. সর্ববিধ উপায়ে জাতীয় সংস্কৃতির অবক্ষয় রোধ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন।

৬. বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল ধর্মাবলম্বীদের ধর্মচর্চা ও অনুসঙ্গী কার্যক্রম পরিকল্পনার ও বাস্তবায়নের অবাধ সুযোগ রয়েছে এবং থাকবে। তবে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে যার দ্বারা অন্য সম্প্রদায়ের মানসিকতা আহত হবার সম্ভাবনা থাকে। সাম্প্রদায়িকতা শূণ্য বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সম্প্রীতি পরিপূরক কার্যক্রমের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করতে হবে।"[৪৩]

সৈয়দ আলী আহসানের সংস্কৃতি চিন্তা স্বচ্ছ, পরিস্কার। তিনি ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পরস্পর সহযোগী মনে করেছেন, প্রতিযোগী নয়। তিনি ধর্মকে সংস্কৃতির অংশ মনে করেননি, সংস্কৃতিচর্চাকে ধর্মের অনুসঙ্গ মনে করেছেন। তিনি মনে করেন সকল ধর্মের মানুষের ধর্ম-কর্মের স্বাধীনতার যেমন অবাধ সুযোগ থাকবে; তেমনি ধর্মাশ্রিত মানবিক গুণাবলী বিকাশে জাতীয় ঐক্য রক্ষায় ধর্ম সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবে। তাঁর মতে, ধর্মীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়েই বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানবতাবোধের সাথে ঐক্য রক্ষা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

২. উদারনৈতিক চিন্তাধারা

বৃটিশ ভারতের মুসলিম জাতীয়তার ঐতিহ্যকে নয়, যাঁরা অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাংলাদেশের জাতীয়তার ভিত্তি মনে করেন, তাঁদের সংস্কৃতি-চিন্তা উদার ও অসাম্প্রদায়িক। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালীর সমন্বিত সংস্কৃতিবোধ তাঁদের চিন্তার প্রধান অবলম্বন। দেশজ ও লোকজ ঐতিহ্যলালিত হিন্দু-মুসলিমের মিলিত সাধনায় আবহমান বাংলায় যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার বিকাশ ও প্রসার তাঁদের আরাধ্য। এই ধারার চিন্তকরা, ধর্মকে সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন না করে সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ ধারার নির্বাচিত তিন জনের সংস্কৃতি চিন্তার স্বরূপ তুলে ধরা হল।

কবীর চৌধুরী (জন্ম ১৯২৩)

বিশ্ব সাহিত্যের সাথে বাঙালি পাঠকের সেতুবন্ধন সৃষ্টিতে নিরলস প্রয়াসী, বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম কবীর চৌধুরী। বিশ্ব সাহিত্য পঠন-পাঠন এবং ব্যাপক অনুবাদের মধ্য দিয়ে তিনি বহির্বিশ্বের সাথে বাঙালী পাঠকদের,এবং বাংলাদেশের সাহিত্যকে বহির্বিশ্বে পরিচিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, প্রাচ্যবিদ, খ্যাতিমান ভাষাবিজ্ঞানী ডঃ আনোয়ার দিল কবীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন: "In my estimation, he has greatly enriched both Bengali and English languages and cultures through his translation of more than fifty major works of literature in Bengali and English"[৪৪] কবীর চৌধুরীর অনুবাদকর্মকে তিনি Translation নয় Transcreation মনে করেন। তাই কবীর চৌধুরীকে তিনি "Transformational leader of our Time"[৪৫] বলে অভিহিত করেছেন।

"কবীর চৌধুরী অনেক লিখেছেন এবং অনবরত লিখে চলছেন; সহজ ভাষায় সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি বলতে পারেন ও লিখতে পারেন। বহুবিষয়ে তাঁর কৌতুহল আছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সুজন ও সদালাপী।....কিন্তু বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাবাদর্শ প্রভৃত বিষয়ে তিনি কখনো গভীরভাবে চিন্তা করেননি। তবে তিনি অনেক কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী।"[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

আসলে বাংলাদেশকে বিশ্বসাহিত্যের সাথে পরিচিত করতে অনুবাদক হিসেবে আত্মনিয়োগ করায়, মননশীলতায় তিনি ততবেশী প্রাগ্রসর হতে পারেননি। কিন্তু "সমাজ পরিবর্তনের শক্তি কোথায় কিভাবে কাজ করে, তা জানেন তিনি এবং তাই চেষ্টা করেন অর্থপূর্ণ পরিবর্তনের জন্য নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে কাজ করতে।"[৪৭] এজন্য বিশ্বসাহিত্যের পঠন-পাঠন, দীর্ঘ জীবনাভিজ্ঞতা, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ঘনিষ্ঠতা ও রাজনৈতিক সচেতনতায় ঋদ্ধ কবীর চৌধুরীর চিন্তা ভাবনাকে গুরুত্ব দিতেই হয়।

কবীর চৌধুরীর সংস্কৃতিচিন্তায় অখন্ড বাঙালী সমাজ গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি ইসলাম ধর্মকে বাঙালী সংস্কৃতির একটি উপাদান মনে করেন কিন্তু একমাত্র উপাদান নয়। তিনি সমন্বয়ের মধ্যেই সংস্কৃতির বিকাশ দেখেন, সাংস্কৃতিক বিশুদ্ধতা নামক কৃত্রিমতায় নয়। সংস্কৃতির সংগা নির্ধারণ করেছেন তিনি এভাবে : "কোন একটি জনগোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার, ধর্মবিশ্বাস, জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি, তাদের জীবনের হাজারও উপকরণ ও উপাচার, তাদের ভাষা-সাহিত্য-চিত্রকলা-সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদি মিলেই তাদের সংস্কৃতি।"[৪৮]

তাঁর মতে, সংস্কৃতি রূপান্তরশীল এবং সংস্কৃতির উপাদানগুলো কখনো একটি অপরটির চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে, জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে কোন উপাদান-ই সর্বাবস্থায় সর্বকালের জন্য প্রধান হয় না। সংস্কৃতির একরৈখিক ব্যাখ্যাকে তিনি সংস্কৃতির একটা দিকের-ই প্রতিফলন ঘটে বলে মনে করেন। সংস্কৃতির 'এ শিল্প-সাহিত্য-ললিতকলার' বিকাশকে সংস্কৃতির একমাত্র পরিচয়, এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি গোপাল হালদারের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছেন। জীবন সংগ্রামের বাস্তব উপকরণসমূহ (material means) সমাজ দেহের বাস্তব অবস্থা (Social structure) এবং মানবসম্পদ যা সমাজসৌধের শিখরচূড়া (Super Structure) এই তিন অবয়বে সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। তিনি সমন্বয়কে সুস্থ জাতীয়তার অন্যতম আশ্রয় মনে করেন এবং বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি প্রশ্নে বলেন- "The foundation of our culture is our thousand years old Bengali Nationalism which acquired new dimensions through our liberation war 1971...our culture is based on

Dhaka University Institutional Repository

the values of secularism, democracy, liberal humanism, egalitarianism and Bengali nationalism."[৪৯]

স্বাধীন বাংলাদেশের এই সাংস্কৃতিক ভিত্তির সাথে অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক যোগসূত্র অন্বেষণ করেছেন। সংস্কৃতি জাতীয়তার ভিত্তি। বাঙালী সংস্কৃতি তাই বাঙালী জাতীয়তার ভিত্তি। তার মতে "প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশে তার মাটি, প্রকৃতি ও পারিপার্শ্ব থেকে প্রাণরস আহরণ করে একান্তভাবে দেশজ ও লোকজ ঐতিহ্য লালিত হিন্দু মুসলমান, নির্বিশেষে এক ইন্টিগ্রেটেড বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।"[৫০]

তিনি বাঙালী সংস্কৃতির গঠন ও বিকাশে এই 'ইন্টিগ্রেটেড সংস্কৃতি'র বিকাশ চান- যার সার্বিক প্রতিচ্ছবির পরিচয় মেলে বাঙালির ইতিহাসে...."সম্প্রদায়ভেদে, শ্রেণীভেদে, ধর্মভেদে, পেশাভেদে, কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠান ও জীবন যাপন রীতির ক্ষেত্রে উপরের স্তরে দৃষ্টিগ্রাহ্য বিভিন্নতা থাকলেও মৌল স্তরে নিবিড় ঐক্য ছিল। ব্যাপক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আবেগ অনুভূতির ক্ষেত্রে তলের দিকে বিদ্যমান ঐ মৌলিক ঐক্যই তখন সমাজকে বেঁধে রেখেছিল,তার সুস্থতা সুনিশ্চিত করে ছিল এবং নানা বিচিত্র ও আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপকে সম্ভব করে তুলেছিল। বাঙালীর লোকসঙ্গীত, লোকগাঁথা, লোককাব্য, বাউল সাধনা ও গ্রামীণ মেলাসহ নানা লোক উৎসবের মধ্যে আমরা তা লক্ষ্য করি। ধর্মীয় উগ্রতাসৃষ্ট ভেদবুদ্ধি তখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি।"[৫১] বাঙালী সংস্কৃতি পরিবর্তনের ধারায় তিনি বাংলাদেশ ভূখন্ডে সংস্কৃতির ভেদবুদ্ধিতা প্রবেশের কারণ হিসেবে ইংরেজ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শাসনকে চিহ্নিত করেছেন। এই সময়ই নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে সংস্কৃতির যে রূপান্তর ঘটেছে "সে রূপান্তরে সমন্বয় আর তেমন থাকল না। রাজনৈতিক ঐতিহাসিক কারণে গোটা উনিবিংশ শতক জুড়ে, এমনকি বিংশ শতকে কিছুটা পর্যন্ত, উপরোক্ত রূপান্তর বাঙালী মুসলমানের জীবনকে ইতিবাচকভাবে স্পর্শ করল না। ফলে এ যাবৎ কাল ঐতিহ্যভিত্তিক সমন্বিত বাঙালী সংস্কৃতির যে ধারা গড়ে উঠেছিল তার বিকাশের পথে প্রাচীর তৈরী হতে শুরু করল।"[৫২]

বাঙালির সমন্বিত সংস্কৃতির বিকাশের পথে এই প্রাচীর প্রতিক্রিয়াশীলতা, সাম্প্রদায়িকতাকে ধরে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেল। শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমানের মনে এই

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা রেনেসাঁসের পথ ধরে হলোনা, রিভাইভালিজমের পথে অগ্রসর হলো। এই সমাজের আরেকটি অংশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সম্বলিত একটি নতুন ধারা ও যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালী সংস্কৃতি খন্ডিত হয়ে গেল যদিও তৃণমূল পর্যায়ে বাঙালী সংস্কৃতি রয়েছে প্রায় অখন্ডিত, সমন্বিত। ১৯৪৭ এর দেশভাগে রাষ্ট্রীয় ও নাগরিকত্বের পরিচয়ে বাঙালীকে বিভক্ত করা সম্ভব হলো না। কারণ "....সাংস্কৃতিক বিভাজন রাজনীতির সহজ সূত্র ধরে ঘটে না, তার একটা নিজস্ব যুক্তি থাকে।"[৫৩] সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বনকে 'ধর্ম' বিবেচনা করায়, হাজার বছরের সমন্বিত সংস্কৃতির বিকাশকে রুদ্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করলে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আবারো হাজার বছরের সমন্বিত সাংস্কৃতিক চেতনা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। যার ধারাবাহিক স্ফুরণ ঘটে ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বাংলাদেশে এই ঐতিহ্যবাহী সমন্বিত সাংস্কৃতিক সত্তার বিকাশ-ই কবীর চৌধুরীর আরাধ্য। তিনি বাংলাদেশের এই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটি জাতিরাষ্ট্রের সংস্কৃতির বিকাশে পল্লীর জনগণকে বাঙালী সংস্কৃতির মূল ধারক ও বাহক বলে মনে করেন। গ্রামবিযুক্ত শিক্ষিত নাগরিক সংস্কৃতিকে সংস্কৃতি মনে করাকে তিনি সাংস্কৃতিক চিন্তার সীমাবদ্ধতা মনে করেন। শ্রমজীবী মানুষের উন্নত সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ সাংস্কৃতিক বিকাশের পূর্বশর্ত। "জীবিকাগত ও বাস্তব উপকরণগত অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিকাশের বিষয়টি ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত। অর্থনৈতিক বিকাশধারা যখন সমগ্র জনগোষ্ঠীকে ইতিবাচকভাবে স্পর্শ করে তখনই সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। তখন পল্লী ও নগরের ব্যবধান হ্রাস পায়, লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নগর-সংস্কৃতির একটা স্বাভাবিক যোগসূত্র গড়ে ওঠে (আজকের রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে যে কৃত্রিম যোগসূত্র গড়ে তোলার ব্যর্থ প্রয়াস চালানো হচ্ছে সেরকম নয়) এবং তখন বিশ্ব সংস্কৃতির সঙ্গেও তার রাখী বন্ধন ঘটে।"[৫৪]

বাঙালী জাতীয়তাবাদের অন্যতম ভিত্তি বাঙালী সংস্কৃতি। যার রূপ আবহমানকালের সুস্থ সমন্বিত রূপ পেয়েছে। সে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি অসাম্প্রদায়িক; ধর্মনিরপেক্ষ। বাংলাদেশী পরিচয় হবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভৌগোলিক পরিচয়ের মধ্যে, আর বাঙালী পরিচয় হবে "একটা গৌরবোজ্জ্বল ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী উত্তরাধিকারী হিসেবে যেখানে রাষ্ট্রীয় সীমানা কিংবা ধর্মীয় বৃত্ত মুখ্য নয়।"[৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক কর্মধারাকে, কবীর চৌধুরীর মতে, উচ্চবিত্ত অঙ্গন থেকে মুক্ত করে গণমুখী করতে হবে। গণমানুষের সাথে মধ্যবিত্ত সমাজের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে যুক্ত করার মধ্য দিয়েই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজেছেন তিনি। এবং এই সাংস্কৃতিক শক্তিই বহির্বিশ্বের সাথে নিজেদের আত্মপরিচয়ে সহায়ক হবে বলে তিনি মনে করেন। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক পার্থক্য সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এক সাক্ষাৎকার থেকে, সেটি উদ্ধৃত করছি: "দুই বাংলার অঞ্চলভেদে ভাষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কিছু গৌণ পার্থক্য থাকবেই। সাম্প্রতিক ইতিহাসের ভিন্নধারার জন্যও কিছু পার্থক্য থাকবে। কিন্তু উভয় বাংলার বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির মূল স্রোত অভিন্ন। এর পিছনে আছে হাজার বছরের ইতিহাস এবং সাম্প্রতিক কালের উদার মানবতাবাদী আন্তর্জাতিক মনন ও চিন্তার বিকাশ।"[৫৬]

সবশেষে বলা যায় "কবীর চৌধুরী 'সব বাঙালীর-এপার ও ওপারের-' তাঁর বাঙালী মানসে আত্মস্থ করেছেন বাঙালি সংস্কৃতির সামগ্রিক সত্তা।"[৫৭]

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (জন্ম ১৯২৭)

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বাংলাদেশের সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে বাংলাদেশকে চিনতে চেয়েছেন এবং চিনতে গিয়ে 'উত্তরাধিকার'কে বুঝতে চেয়েছেন এবং 'উত্তরাধিকারবোধের ভিত্তিতে সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। উত্তরাধিকার 'প্রকৃতি-সিদ্ধ' ব্যাপার। তবে এই 'প্রকৃতি-সিদ্ধ' ব্যাপারটি বহতা 'নদীর মত' হলেও তার স্রোতধারা মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তার নিজের 'সম্পদে', 'বৈশিষ্টে' ও নানা 'পরিবেশে'র পরিচর্যার মধ্য দিয়ে যুগের পর যুগ ধরে প্রবহমান। তাই উত্তরাধিকার প্রকৃতির ন্যায় শাশ্বত। ইচ্ছেমত এই নিয়মের উপর জোড় চালানো যায় না বা যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে গড়ে তোলাও যায় না, কালানুক্রমিকভাবে এটি গড়ে ওঠে। এর মধ্যেও প্রাকৃতিক নানা দ্বন্দ্ব ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমন্বয় ঘটে থাকে। এ নিয়ন্ত্রণ ঘটে "ভৌগোলিক ধর্মীয় এবং সামাজিক ব্যাপকতার বলয়ে, বলা যেতে পারে– সাংস্কৃতিক।"[৫৮] আরো পরিস্কারভাবে দেখলে দেখা যায় মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ভূগোল, ভাষা এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয় করেছেন।

ক্রমবর্ধমান মানব সমাজে ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার চেতনার প্রয়োজন অবশ্যই স্বীকার্য। এই চেতনা মানুষকে নিজের পরিচয় সম্পর্কে সজাগ করে তোলে। সজাগ দৃষ্টি দিয়ে নিজের জগত ও

Dhaka University Institutional Repository

জীবনকে দেখবার জন্য অনুপ্রাণিত হয় মানুষ। "বাংলাদেশের মানুষের জন্য এ প্রয়োজন সাম্প্রতিক কালে বিশেষ করে দেখা দিয়েছে।"[৫৯] এর কারণ বিগত তিন দশকে সংঘটিত দু'টি ঐতিহাসিক ঘটনা যার একটি ৪৭ এর ভারত বিভাগ এবং পাকিস্তানের সৃষ্টি এবং অপরটি ৭১-এর সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা।[৬০]

এই ঘটনারও মূল অনেক গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের মানুষের 'সমগ্র অস্তিত্বের' প্রয়োজন থেকেই ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সম্পর্কে অনুসন্ধান আজ জরুরী বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক শ্রেণীর বিকাশের সাথে সাথেই আমাদের "চেতনায় ঠাঁই করে নিল 'ন্যাশনালিজম' 'স্বাদেশিকতার' ধারণা।"[৬১] এই ঐতিহ্য 'উত্তরাধিকার' সচেতনতার সূত্রপাতও ঘটেছে তাই গত শতকে।

বাংলাদেশের বর্তমান ভৌগোলিক পরিচয়, পূর্বের ঐতিহাসিক বাংলাদেশের পরিচয়ের সাথে সম্পূর্ণ মেলে না। কারণ সে সময় বাংলাদেশের যে সীমা সরহদ্দ ছিল এখন তার নানা রূপরেখার পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু পূর্বের ভৌগোলিক যে ঐতিহ্য তা 'আমাদের আপন সম্পদ'। সম্পদকে ফেলে দেয়া যায় না, উপেক্ষাও করা যায় না। উপেক্ষা করলেই বিভ্রান্তি ঘটার আশঙ্কা থাকে। প্রতিনিয়ত এই পৃথিবী ঘুরছে বলেতো পৃথিবীর মানুষ ইতিহাস সচেতন বেশী। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ৫৬ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে আজকের বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক সীমা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চাননি। প্রাচীন জনপদগুলোর যে অংশ বর্তমানে বাংলাদেশে আজও আছে সেগুলোকেও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রশ্নে বিবেচনায় এনেছেন।

ভৌগোলিক পরিবেশে মানুষের বসবাস স্থাপন ও বিস্তারের সাথে সাথে ভাষার রয়েছে গভীর সম্পর্ক। আজকের যে বাংলা ভাষা তাও সমাজের অগ্রগতির সাথে সম্পৃক্ত। নির্দিষ্ট সময়ে বা ক্ষণে তার জন্ম হয়নি "মানব সমাজের প্রবৃদ্ধির সাথে সভ্যতা সংস্কৃতির অগ্রযাত্রার সাথে, মানুষের কর্ম-কান্ডের বিবর্তন ও তার অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের সাথে বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার, বিভিন্ন গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে ভাষা 'ভাষা হয়ে' ওঠে। বাংলা ভাষার উদ্ভব-বিকাশের ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

স্বভাবতই এমনটি ঘটেছে।"[৬২] তাঁর মতে বাংলা হচ্ছে আর্য ভাষা। আর্য বা উপনিবেশ স্থাপনের আগে এ ভাষার তেমন প্রসার ঘটেনি কিন্তু তারা আসার সাথে সাথে ভাষারও প্রসার ঘটে। সাড়ে তিন হাজার বছরের ইতিহাসের উত্তরাধিকার বাংলাভাষা।

বাংলা ভাষার স্বরূপ নির্ণয়ে তিনটি স্তরের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের স্বরূপ অন্বেষণে, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। "১. আমাদের দেশের ভূ-গোল-পরিচয় ২. আমাদের ভাষার উত্তরাধিকার ৩. আমাদের সংস্কৃতির স্বরূপ।"[৬৩] এগুলো অতীত অর্থে। অর্থ্যাৎ আমাদের ভৌগোলিক পরিচয় যদিও পূর্বের ভূ-গোলের মধ্যে এখন আর নেই, আমাদের ভাষাও কালক্রমে নতুনরূপ পেয়েছে, আবার আমাদের সংস্কৃতিও
"ক. 'দেশজ উপকরণ,যা কিনা আর্য-পূর্ব (অস্ট্রিক, কোল মুন্ডা, দ্রাবিড়, তিব্বত-ব্রাহ্মণ উপকরন) খ. আর্য উপকরণ (বাংলা ভাষার দেহকাঠামো আর্য ভাষার সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রভাবে গঠিত, এবং গ. বিদেশী উপকরণ (আরবী-ফারসী-তুর্কী,পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-ফরাসী-ইংরেজী এবং আধুনিক অন্যান্য উপকরণ)- এই সমস্ত উপকরণের সমন্বয়ে এ ভাষার বর্তমান অবয়ব সংগঠিত।"[৬৪]

প্রাক আর্য ভাষার সাথে আর্যভাষার সংযোগে যে ভাষার প্রবাহ তার সাথে আরবী ফারসী ইংরেজীসহ বিদেশী শব্দসমূহ মিলেমিশে এখন তা জনজীবনের নিত্যদিনের সাথী হয়েছে। মধ্যযুগ হতেই ভাষা সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছে, এবং আধুনিক জীবনের সাথে এমনভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে যাকে আর আলাদা করে সমৃদ্ধ করা সহজসাধ্য নয়। ভাষা ইতিহাসের এই পর্যায়ে থেমে নেই, দ্রুত বিবর্তিত হচ্ছে। "অতএব আমাদের ভাষার উত্তরাধিকার, ঐতিহ্যগত কারণেই সামগ্রিকভাবে বাংলাভাষার উত্তরাধিকার।"[৬৫]

কিন্তু ভাষার এ বিবর্তনের সাথে ভাষা সচেতনতারও একটি ইতিহাস আছে। বাঙালী ভাষা চেতনা ও ইংরেজ শাসনামলের পূর্ব থেকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে দেশীয় ভাষা চর্চায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। ১৩৫০ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমলে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্টপোষকতা করা হয়েছিল; কিন্তু মোঘল আমলে ভাষা বিতর্ক শুরু হয়। কবি আব্দুল হাকিমের

Dhaka University Institutional Repository

মানসিক প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায়। বৈজ্ঞানিকভাবে ভাষা অনুসন্ধানের আগে 'নিষেধ' ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে ভাষাচেতনার প্রসার ঘটে। ঊনবিংশ শতকের ভাষা বিতর্ক শুরু বাংলা ভাষার জন্ম নিয়ে। বর্তমান বাংলাদেশেও ভাষার ক্রমপরিবর্তন তিনি লক্ষ্য করেছেন এবং সেটা স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত রূপায়বব নিয়ে কয়েক শতাধিক কাল ধরে গ্রহণ বর্জনে গড়ে উঠেছে। সে ভাষাটি হল প্রমথ চৌধুরী বর্ণিত 'ভাগীরথী তীরবর্তী দক্ষিণদেশী' ভাষা।

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম প্রাচীন, ভূ-গোল ও ভাষার বিরাট পরিসরকে চিহ্নিত করেছেন। দু'তিন হাজার বছরের বাংলাদেশের জীবনেতিহাসের পরিচয় পেতে তিনি অনুসন্ধান করেছেন প্রাচীন ভূ-গোল ও ভাষাকেন্দ্রিক সেই অঞ্চলসমূহের। "...মহাস্থান গড়ের যে ঐতিহ্য, মধ্যযুগে গৌড়ে যে সংস্কৃতিচর্চা, আরাকান রাজদরবার থেকে হুগলী ভুরশুট অবধি যে বাংলা সাহিত্য চর্চা ইত্যাকার গৌরববাহী সকল উপকরণেই আজকের বাংলাদেশের মানুষের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার।"[৬৬]

তিনি সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি অভিধা দুইটির সাথে কর্মের যোগ দেখেছেন। এবং তাঁর মতে 'কর্ম' হল মানুষের 'শ্রম প্রয়াস'। এর উপর ভিত্তি করেই তিনি সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন এভাবে : "মানুষের কর্ম কৃতি থেকেই তার সৃষ্ট সম্পদ, যার আমরা পরিচয় পাই তার অর্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে, তার সাহিত্যে সঙ্গীতে, নৃত্যে,চিত্রে, অপরাপর চারুকলায়,তথা সমগ্র জীবনাচরণে।"[৬৭] অর্থাৎ জীবনের সামগ্রিক কর্মপ্রয়াসের মধ্যেই মানুষের সংস্কৃতি।

'জীবিত ভাষার ন্যায়' আমাদের সংস্কৃতিও প্রবাহমান। নৃতাত্ত্বিক পন্ডিতদের আবিস্কৃত তথ্যানুযায়ী অনার্য,আর্য, এবং আরবীয়-আফগান-তুর্কী-ইরানী আগমনে বহিবাংলা থেকে বিচিত্র ভাষা, বিশ্বাস ও সংস্কার রক্তধারায় মিশে গেছে দেশজ লোকজ উপাদান উপকরণের সাথে। এবং মুস্তাফা নূরউল ইসলামের মতে, "সংঘাতে-সমন্বয়ে, ক্রিয়ায়-প্রতিক্রিয়ায় অবশেষে গড়ে উঠেছে নতুন সংস্কৃতি- বাংলাদেশের ভূখন্ডে সঙ্কর জনগোষ্ঠীর সঙ্কর সংস্কৃতি।"[৬৮]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বাংলাদেশ ভূখন্ডের এই সংস্কৃতিকে 'সঙ্কর সংস্কৃতি' বলে চিহ্নিত করেছেন এবং এই সঙ্কর সংস্কৃতির যে নিদর্শনগুলোর পরিচয় দিয়েছেন সেগুলো তাঁর ভাষায়– "বাংলা ভাষা-নিদর্শনে, পাথরে উৎকীর্ণ লিপিতে-তাম্রশাসন-দানপত্রে, তওয়ারিখ ও রাজমালা জাতীয় রচনায়, কাব্য সাহিত্য-সঙ্গীতে, নৃত্যে, ছড়া প্রবচন-ধাধায়, মন্দির মসজিদ দেউল দূর্গ, প্রাসাদগাত্রে। ...পূর্বপুরুষের ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদের বিবরণে,আহার অভ্যাসের বিবরণে, তাঁদের সামাজিক ও পারিবারিক আচার আচরণের বিবরণে। এতদ্ব্যতীত লোক সংস্কারে, ধর্ম বিশ্বাসে,ধর্মাচরণেও বিধৃত রয়েছে তৎকালীন মানুষের মানস-ভাবনার স্বাক্ষর।"[৬৯]

কিন্তু উপকরণের অভাবে এই সঙ্কর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি তাঁর মতে আজও আবিস্কার করা সম্ভব হয়নি। ইতিহাস পরম্পরায় তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রবহমান বাঙালী জীবন সাধনায় প্রাক তুর্কী আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদের সময়ে, তুর্কী আমলের ব্যাপক আলোড়নের সময়ে, পাঠান আমলে, মোগল আমলের (শহরকেন্দ্রিক দরবারী সংস্কৃতি বিকাশ হয়েছে) কোন সময়েই কৃষিভিত্তিক বাঙালী সমাজের নিরুত্তাপ জীবনকে (যা গ্রামকেন্দ্রিক) প্রভাবিত করেনি। ছোট ছোট পেশার-ডোম, জেলে, মাঝি- এই মানুষগুলোর জীবন বিভিন্ন প্রকার 'ব্রত' 'পাঠনাদি' লোকাচারে ছিল খুবই সাধারণ। এই সাধারণ বাঙালী জীবনকে রাষ্ট্র,সমাজ,ধর্ম, বিশ্বাসের কোন সংস্কারই স্পর্শ করতে পারেনি বাঙালী সমাজে গ্রামীণ লোকায়ত সংস্কৃতির সনাতন ধারাই প্রবহমান ছিল। উপরের অংশের প্রবহমান সংস্কৃতির সাথে এই সাধারণ অংশের কোন যোগাযোগ ঘটেনি। যার ফলে বাংলাদেশে কোন ধর্ম বিশ্বাস বিশুদ্ধ আকারে স্থায়ী রূপ নিতে পারেনি এবং কোন নির্দিষ্ট ধর্মের কোন বিশেষ সংস্কৃতিও সমাজ জীবনে প্রাধান্য পায়নি। 'দেশীয় মানস' 'লোকজ সংস্কার'ই শেষ পর্যন্ত এখানে জয়ী হয়েছে।

সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সমন্বিত জীবনবোধের যে প্রকাশ দেখা যায় তারও 'প্রাণকেন্দ্র' ঐ লোকজীবন। তাই ইংরেজ আমলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটলে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব দেখা যায়। বাংলাদেশের মানুষ দুই সংস্কৃতির অধিকারী। এ দুই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের প্রভাব বাংলাদেশের জনজীবনে পড়ে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনের শিকড় প্রোথিত গ্রামের মাটিতে। নতুন শিক্ষা এবং পেশা এখানকার মানুষের একাংশকে শহর-বন্দর-

Dhaka University Institutional Repository

নগরবাসী করেছে। "বাংলাদেশের মানুষের জীবনাচরণের মূল বৈশিষ্ট্য এখানে নিহিত।"[৭০] তাই বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে ভু-গোল-প্রকৃতি, উপাদান পদ্ধতি, বন্টন ব্যবস্থা, মানস ভাবনা, সংস্কার, ধর্মচেতনা সম্পর্কে সচেতন থাকা আবশ্যক বিবেচনা করেছেন মুস্তাফা নুরউল ইসলাম।

কিন্তু সংস্কৃতির এই দ্বন্দ্ব দেখা দিলেও এটা প্রামাণ্য সত্য যে, লোকায়ত জীবন, দেশীয় মানস ও লোকসংস্কার-ই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। তাই "বাংলাদেশের মানুষের স্বাভাবিক আত্মীয়তা এই সংস্কৃতির সাথে।"[৭১] এজন্যই তিনি বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন এই সহজ প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে। উদ্ধৃত অংশে সে কথাই উচ্চারিত হয়েছে:

"অতএব আবহমানকাল ধরে প্রবহমান যে সংস্কৃতি ধারা, বহু বিচিত্র প্রভাব এবং প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দেশের মাটির আপন পরিবেশে লালিত ও পরিপুষ্ট যে বিশেষ সংস্কৃতি সমস্ত কিছুকে মিলিয়ে নিয়ে সেই যে, ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ জঙ্গম সংস্কৃতি, আজকের বাংলাদেশের মানুষের তাতে সহজ উত্তরাধিকার।"[৭২]

আনিসুজ্জামান (জন্ম ১৯৩৭)

পিতৃপ্রদত্ত নাম আবু তৈয়ব মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, সংক্ষেপে এ,টি,এম আনিসুজ্জামান, আরও সংক্ষেপে আনিসুজ্জামান, জন্মেছেন, ১৯৩৭ সনের ১৮ ই ফেব্রুয়ারীতে কোলকাতায়। " বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মানুষ ও তাঁদের সাংস্কৃতিক অভিপ্রায় এবং তাদের স্বরূপ অনুসন্ধান তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মূল প্রসঙ্গ।"[৭৩] অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের কাছে বাঙালীর জীবন,বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি একই ঐতিহাসিক সূত্রে গ্রথিত"[৭৪] সংস্কৃতি বলতে তিনি বোঝেন– "কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতি ও সুবিন্যস্ত আচরণনীতি, এবং বস্তুগত অর্জন, বুদ্ধিবৃত্তিগত কাজ ও আধ্যাত্মিক ধারণাকে।"[৭৫] সংস্কৃতির দুটি মুখ্য বিষয় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন- বস্তুগত সংস্কৃতি ও মানস সংস্কৃতি। তাঁর ব্যাখ্যায় বস্তুগত সংস্কৃতি হল সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে-সঙ্গীতে মানসিক প্রবৃত্তির যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে তা এবং জাতীয় সংস্কৃতিতে তাঁর মতে, 'বস্তুগত ও মানস সংস্কৃতির সম্মিলিত রূপের প্রকাশ' ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালী সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন অনেক সংস্কৃতির সম্মিলনে গঠিত হয়েছে। বাংলার আদি জনপ্রবাহ ছিল প্রাক-আর্য নরগোষ্ঠীর। এর পরে তাদেও উপর আর্যদের প্রভাব পড়ে। মুসলমানরা যখন এদেশ জয় করেছিল, তখন তাদের সংস্কৃতির (তুর্কী-আরব-ইরান-মধ্য এশিয়া) প্রভাবও বাঙালী সংস্কৃতির সাথে মিশে যায়। পরবর্তীতে আঠার শতকের মধ্যভাগে ইংরেজ শাসনের ফলে ইউরোপীয়রা এদেশের সংস্কৃতির সাথে বিশ্বসংস্কৃতির যোগ ঘটায়। আর সে দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি বলেছেন: ''বাংলাদেশে আমরা যে সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করছি তা অনেক পুরনো। এই সংস্কৃতির কিছু বৈশিষ্ট্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে মিলে, কিছু বৈশিষ্ট্য আলাদা করে সনাক্ত করা যায়। নৃতাত্ত্বিক বিচারে, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশে, ধর্মানুপ্রেরণায়, বর্ণপ্রথায়, উৎপাদন প্রথার অনেকখানিতে বাঙালী সংস্কৃতির মিল পাওয়া যাবে গোটা উপমহাদেশের সঙ্গে।''[৭৬] বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যও পরিস্ফুটিত হয়েছে এই ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে। নিজস্ব ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রকৃতিগত বিচিত্রতা, বহিরাগত সংস্কৃতির সাথে যোগ-বিয়োগে বস্তুগত ও মানস সংস্কৃতিতে যে প্রভাব পড়েছে তা উপমহাদেশের অন্য সংস্কৃতির সাথে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও সর্বশেষ বিচারে তা স্বতন্ত্র। ''বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হতে থাকে খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে।''[৭৭]

সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এই পর্যায়ে সমাজের সব মানুষ একই বস্তুগত ও মানস সংস্কৃতির অধিকারী ছিল না, ভেদাভেদ ছিল। উচ্চবর্গের মানুষেরা ভাষা, সঙ্গীতের চর্চা করত তারা যা ব্যাবহার করত নিম্নবর্গের মানুষরা সেসব জিনিসপত্র ব্যবহার করতে পারত না। ''লোক সাহিত্য ও শিষ্ট সাহিত্যের ভেদও ছিল। তবে বাংলার সাহিত্য ও সঙ্গীত সমাজের প্রায় সকল স্ত রকে স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছিল। এজন্য বাংলার মানস সংস্কৃতিতে সবচেয়ে প্রাধান্য সাহিত্য ও সঙ্গীতের।''[৭৮] ''বাংলাদেশের সমাজ আজ ঔপনিবেশিক নয়, কিন্তু আগের মতই শ্রেণীবিভক্ত। তাই সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সকলের অধিকার সমান নয় এবং এক শ্রেণীর সৃষ্ট সংস্কৃতিতে অন্য শ্রেণীর প্রবেশাধিকার নেই; আবার এক শ্রেণীর সৃষ্ট সংস্কৃতি অন্য শ্রেণীর পক্ষে রুচিকর নয়। সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন না হলে এই অবস্থার কোন বদল আশা করা যায় না।''[৭৯]

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিকতত্ত্ব অধ্যয়নের অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে চিন্তা করেছেন তিনি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য অবলম্বনে তিনি বাঙালী সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলার সংস্কৃতি 'ধর্মকলহ' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একটা সমন্বিত রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। সেখানে দেবতার চেয়ে মানুষই বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ইংরেজ আমলের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে যে মুষ্ঠিমেয় শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকশিত হলো, তাদের বাইরে সেই সংস্কৃতির বিকাশ সমাজে ঘটেনি। ইংরেজ আমলের এই সাংস্কৃতিক বৈষম্য ও সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত বাঙালির জীবনের রাষ্ট্রীয় বৈরী পরিবেশ, কীভাবে বাঙালি জাতিকে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নতুন জাতীয়তাবোধে উত্তীর্ণ করেছে তা তাঁর ভাষায় তুলে নিম্নরূপ:

"....এক ধরনের প্রভেদ- ধর্মের ভিত্তিতে উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি বলে দাবী করা হয় এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায় তা বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু পাকিস্তান পরে দেখা গেল,নতুন রাষ্ট্রের ধর্মভিত্তিক অবস্থান ক্ষণস্থায়ী। সাংস্কৃতিক বহুত্বের বাস্তব ক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসকেরা এক সংস্কৃতিবাদ চাপিয়ে দিতে চাইলেন। নিজেদের সংস্কৃতির ওপর এই আক্রমণ পর্যুদস্ত করার লক্ষ্যে পাকিস্তানের বাংলাভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠেরা যথাসাধ্য করেছে; বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে প্রাণ দান, বাংলায় আরবি হরফ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ, ধর্মীয় ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিভক্ত করার প্রয়াসের প্রতিবাদ এবং অন্যদিকে ঐতিহ্যমন্ডিত সাংস্কৃতিক দিনক্ষণ ও উৎসব পালন ও তার পুণঃপ্রবর্তন। বাঙালী পরিচয়ের উপরে যতই তারা জোর দিতে চাইলো, ততই ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটল। ঐ পরিবেশে তা ঘটাই ছিল অনিবার্য। সাংস্কৃতিক সত্তা সম্পর্কে এই নবজাগ্রত উপলব্ধির সঙ্গে রাজনৈতিক আশাভঙ্গ ও অর্থনৈতিক বিক্ষোভের বেদনা যুক্ত হয়ে বাংলাদেশের রক্তাক্ত অভ্যুদয় সম্ভবপর করে তুললো।"[৮০]

ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা এই জাতীয়তাবাদী স্বাতন্ত্র্য চিন্তা ১৯৭৫ এর পর বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিপরীত তত্ত্ব হিসেবে শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। "আনিসুজ্জামান বাঙালীর যা কিছু উত্তরাধিকার তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁর জীবনের ভিত তৈরী করেছে বাঙালী সংস্কৃতি। কিন্তু তাঁর বাঙালী জীবন ও সংস্কৃতির সেই দিকটাই শ্রদ্ধেয় ও গ্রহণযোগ্য যা মানবাতাবোধজাত অসাম্প্রদায়িক।"[৮১]

বাঙালি-বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বিরোধ এখনও সম্পূর্ণ প্রশমিত হয়নি, তার সাথে পাহাড়ী জনগণের জাতীয়তাবোধও দৃঢ়তার সাথে উচ্চারিত হচ্ছে। এই প্রশ্নে আনিসুজ্জামানের মন্তব্য

Dhaka University Institutional Repository

"It must also be acknowledged by all, including the hills men that the war of liberation was inspired by Bengali nationalism that grew from strength to strength between 1952 and 1971. The citizens of Bangladesh, Bengalis or non Bengalis may be known as Bangladeshis so that the Bengali identity is not imposed on there's, but the overwhelming majority of the people denied their Bengali nationality."[৮২]

তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী সংস্কৃতির পরিচয়ের মধ্যে পাহাড়ী সত্তার স্বীকৃতি দিতে গিয়ে তাদের নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু তাদেরকে জাতীয়তার অংশ দিতে চাননি। শুধু রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার খাতিরে তিনি অবাঙালি জনগোষ্ঠীকে জাতির অংশ বলে সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছেন। ডঃ সাঈদ-উর রহমান তাঁর এ পরিবর্তিত মনোভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন "গত এক দশকের ঘটনাপ্রবাহে (আনিসুজ্জামানের) জাতীয়তাবাদী চিন্তায় নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়। এই চিন্তার যৌক্তিক পরিণতি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ।"[৮৩]

আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক তত্ত্ব অধ্যয়নের অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি চিন্তা করেছেন। তাঁর সংস্কৃতি চিন্তার স্পিরিট "ইহজাগতিকতা তাই 'যে কোন সমস্যার বাস্তবানুগ ও প্রয়োগসম্ভব সমাধান তাঁর সহজাত।"[৮৪] বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সত্তা বিশ্বায়নের সাথে কীভাবে নিজেকে সামঞ্জস্য বিধান করবে বা বিশ্বায়নের স্রোতে আত্মরক্ষা করবে কীভাবে, সে ব্যাপারে তিনি নিঃশঙ্ক। আন্তর্জাতিক মান সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ আনিসুজ্জামান বাঙালিত্বের সাথে আন্তর্জাতিকতার কোন দ্বন্দ্ব দেখেননা। এজন্যই তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন– "দ্বন্দ্ব একটা জেগেছে- আমরা বাঙালী হবো না আন্তর্জাতিক হবো? আমাদের সংস্কৃতিতে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য প্রবল হবে না বিশ্বজনীন ঝোঁকটাই প্রবল হয়ে উঠবে? আশা করা যায় আমরা বাঙালী থাকবো এবং বিশ্ববাসী হবো, দেশকে ভালবাসব ও আন্তর্জাতিকতায় উদ্বুদ্ধ হবো।"[৮৫]

আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে মানবিকতার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করেছেন আনিসুজ্জামান। এবং তিনি 'এ কালের আধুনিক সংস্কৃতিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা সরবে' শুনতে পান। আনিসুজ্জামান মনে করেন, "বাঙালী সংস্কৃতির প্রবহমান ধারায় মানব কল্যাণ ও সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায়ের প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাত ফুটে উঠেছে। এবং এখানেই বাঙালী সংস্কৃতির গৌরবের বিষয়। তাই 'আমাদের সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ নিয়ে যেমন আমরা গর্ব করতে পারি, তেমনি তার এই ভাববস্তুও আমাদের গৌরবের বিষয়।"[৮৬] আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতিতে স্নাত সমাজে সাংস্কৃতিক ব্যাবধান অনিবার্য। নবীন ও প্রবীণের ব্যাবধানজনিত সংস্কৃতিকে তিনি বাস্তব বলে মেনে নেন এবং এ ব্যবধান ঘোচানো সহজ ও সম্ভব নয় জেনেও পূর্ব ও উত্তর প্রজন্মের মধ্যে আন্তরিক সেতুবন্ধন তৈরী করতে আগ্রহী এবং এ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ -"ব্যবধান সত্ত্বেও এক প্রজন্ম যেন অন্য প্রজন্মকে বুঝতে চেষ্টা করে, যেন কেবল বিচারকের আসনে বসে রায় না দেয়, যেন দেশ কাল পরিস্থিতি বিবেচনা করে সেতুবন্ধ রচনার প্রয়াসী হয়।"[৮৭]

কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান ও অতীতের শ্রেণী বিভক্ততা দেখে আনিসুজ্জামান কিছুটা হতাশ। তাঁর মতে, বাঙালি সমাজে শ্রেণীগত ব্যবধান এত বেশী যে, 'এক শ্রেণীর সাথে অন্য শ্রেণীর সংস্কৃতি আন্তঃযোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থ। এর কারণ রুচিগত ব্যবধানের প্রকটতা। এই আন্ত ঃশ্রেণী-সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ব্যবধানের দেয়াল উঠিয়ে ফেলতে তিনি 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন'কে উপায় মনে করেন। কিন্তু কাঙ্খিত 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন' সমাজে কীভাবে আসতে পারে তা তিনি নির্দেশ করেননি।

তিনি মনে করেন, বহুজাতিক রাষ্ট্র ও সমাজে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সহ অবস্থান সম্ভব। প্রত্যেক জাতির মধ্যে একাধিক সমাজ সম্মানের সাথে বাস করার জন্য সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন দরকার। এই সমন্বয় মানে এক সংস্কৃতিবিশিষ্ট হওয়া নয়। তিনি মনে করেন, "বহুজাতিক সমাজের ধারণা যেখানে রাজনৈতিক ভাবে গৃহীত, সেখানেই একাধিক সংস্কৃতির সহাবস্থান সম্ভবপর।"[৮৮]

Dhaka University Institutional Repository

৩. সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা

সমাজতান্ত্রিক ও মার্কসবাদী সংস্কৃতির ধারা বাংলাদেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে নানাভাবে আন্দোলিত করেছে। উদারনৈতিক চিন্তা ধারার সাথে তাঁদের চিন্তার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুই-ই লক্ষ্য করা যায়। উদারনৈতিক চিন্তা ধারার সাথে এই ধারার মূল পার্থক্য হলো এঁরা রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দর্শনে সমাজতন্ত্র কেন্দ্রিক চিন্তা করেন এবং সমাজতন্ত্র ভিত্তিক সংস্কৃতির ধারণা বিকশিত করতে চান। এ ধারার সকল চিন্তকের চিন্তার প্রকৃতি এক রকম নয়। সমাজ সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র কাঠামোর আমূল পরিবর্তনে এই ধারার চিন্তকরা মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী। এ ধারার নির্বাচিত কয়েকজন চিন্তকের সংস্কৃতি চিন্তার স্বরূপ তুলে ধরা হল।

আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)

আহমদ শরীফের জন্ম ১৯২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম জেলার সুচক্রদন্ডী গ্রামে। একজন সচেতন প্রগতিশীল লেখক বুদ্ধিজীবী হিসেবে সমাজে বিদ্যমান সকল প্রকার অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন 'আমৃত্যু দ্রোহী ও প্রতিবাদী'। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ সংকলন, 'বিচিত চিন্তায়' (১৯৬৮) সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনাই বেশী স্থান পেয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ের রচনাতেও সমাজ সংস্কৃতি বিষয়টি নানাভাবে নানা মাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে। আহমদ শরীফ মানবতন্ত্রে আস্থাশীল। তাঁর মানবতন্ত্রের ভিত্তি সমাজতন্ত্র। মানবতন্ত্রে উত্তরণের জন্য ব্যাপক মেহনতি মানুষের মুক্তির পথ হিসাবে গ্রহণ করেছেন সমাজতন্ত্রকে। যতদিন পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের চেয়ে উন্নত মতবাদ আবিস্কৃত না হয় ততদিনই সমাজতন্ত্র তাঁর আদর্শ। " আহমদ শরীফ ছিলেন একান্তভাবেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও দ্রোহী। 'দ্রোহ' শব্দটি ছিল তাঁর খুবই প্রিয়। দ্রোহের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলেই মার্কসবাদের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা কখনো কখনো তিনি ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু মার্কসবাদের প্রতি অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি কমিউনিস্ট হননি, কমিউনিস্ট হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবই ছিল না।"[৮৯]

আহমদ শরীফের যুক্তিপ্রবণ মন যুক্তির বাইরে কিছুই মানতে চায়নি। সবকিছুর সাথে তিনি জড়িয়ে থেকেও স্বাতন্ত্র্যের কারণে ছিলেন ভিন্নতর। "এজন্যই তিনি ষাটের দশকের শেষার্ধ

Dhaka University Institutional Repository

থেকে মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনে সাহস ও দ্রোহের প্রতীক হিসেবে তাঁর ভূমিকা পালন করেছেন।"[৯০]

তিনি সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার মূর্খতা, কপুমন্ডুকতা, কুসংস্কার, ধর্মন্ধতা, মতান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, শোষণ, বঞ্চণা, নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে যুক্তিনির্ভর বিবেকী ভূমিকা পালন করেছেন এবং কখনো কখনো আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। সক্রিয় ভূমিকা রাখতে গিয়ে নিন্দিত ও নন্দিত এই দুই-ই ছিল তাঁর প্রাপ্তিতে। সেজন্য তিনি পিছপা হননি, ভীতও হননি। মেধার সাথে পরিশ্রম, সাহস ও সততা বিশেষ করে স্পষ্টবাদিতা তাকে ভিন্নমাত্রার বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। তাঁর সংস্কৃতি চিন্তা স্বদেশ ও স্বজাতির শ্রেয়োচেতনাজাত। এ সম্পর্কে তিনি বলেন "...কোনো দেশের বা সমাজের সম্প্রদায়ের মানুষের শ্রেয়োচেতনাজাত পরিস্রুত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার আচরণের প্রাত্যহিক বা সার্বক্ষণিক অভিব্যক্ত রূপই তার সংস্কৃতি।"[৯১]

আহমদ শরীফ নিজেকে যখন বাঙালি বলেন তখন তিনি তার সাথে বলেন বাঙালি বলেই তিনি নাস্তিক। এ সম্পর্কে তাঁর একটি মত তুলে ধরা যায় "....ইতিহাসন্তর্গত যুগে দেখতে পাই বাঙালী মনোভূমি কর্ষণ করেছে সযত্নে।...এ যেন তার নিজের এলাকা, সেই এই মাটিকে ভালবেসেছে, সে এ জীবনকে সত্য বলে জেনেছে। তাই সে দেহতাত্ত্বিক, তাই সে প্রাণবাদী, তাই সে যোগী ও অমরত্বের পিপাসু। এজন্য নির্বাণবাদী বুদ্ধের ধর্মগ্রহণ করেও সে কায়া সাধনায় নিষ্ঠ। তার কাছে এ মর্ত্যজীবনই সত্য, পারত্রিক জীবন মায়া।"[৯২] এ বিশ্বাসে আমৃত্যু তিনি স্থিত ছিলেন। বাঙালির চিন্তাজগতকে তিনি আবিস্কার করেছেন। "চিন্তাজগতে বাঙালী চিরবিদ্রোহী। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম ধর্ম সে নিজের মত করে গড়তে গিয়ে যুগে যুগে সে চিন্তাজগতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। বাহ্যত সে ভাববাদী হলেও, উপযোগতত্ত্বেই তার আস্থা ও আগ্রহ অধিক।"[৯৩]

বাঙালি জীবন ও জীবিকার অনুকূল পরিবেশ করে নিতে চায় এবং বাঙালি রাজনীতি সচেতন কিন্তু ক্ষমতাপরায়ন হতে পারে না, তার নিজেদের মনন বৈশিষ্ট্যের কারণে। "...কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ বাঙালীর মানস সন্তান হলেও নেতৃত্ব থাকেনি বাঙালীর। ...মুঘল বাহিনীর সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রামে জানমাল উৎসর্গ করতে বাঙালীরা দ্বিধা করেননি বটে, কিন্তু নিজেদের জন্য স্বাধীনতা কিংবা সম্পদ কামনা করেননি।"[৯৪]

আড়াই হাজার বছর ধরে বাঙালি পরাধীন থাকায় দাসত্ব মনোভাবের প্রভাব বাঙালি মননকে আচ্ছন্ন করেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য 'জীবন জীবিকাসম্পৃক্ত সংস্কৃতি' কে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আহমদ শরীফ ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। আহমদ শরীফ "ঐতিহ্য ও সংস্কারকে বিচার বিশ্লেষণ করেন সমকলীন জীবন দৃষ্টি থেকে, চিরাচরিত ধ্যান-ধারনার অচলায়তনকে ভাঙেন যুক্তি ও মননশীল পান্ডিত্য দিয়ে। বস্তুবাদী দর্শনে সমগ্রসত্তা আঘাত করে সমাজের উপরিসৌধের দেয়ালে। প্রথাবদ্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে এভাবেই ফেটে পড়ে তার বিদ্রোহ: ঐতিহ্যই হয়ে ওঠে তাঁর আগল ভাঙার হাতিয়ার।"[৯৫] ঐতিহ্যের অহমিকা, ঐতিহ্যের পিছুটান, ঐতিহ্যের অতীতমুখীনতা মানুষকে প্রগতিবিমূখ ও প্রগতিভীরু করে তোলে। শুধু তাই নয়, তিনি মনে করেন, সম্প্রদায়ভিত্তিক মিথ্যা ঐতিহ্যচেতনা জাতির বড় হওয়ার পক্ষে অন্ত রায়। আত্মপরিচয় তা যেমনই হোক না কেন তাতে লজ্জিত না হয়ে স্বরূপে নিজেকে জানবার চেষ্টা ও কর্ম-ই ভবিষ্যৎ বাঙালীর উন্নতির উপায় অন্বেষণের হাতিয়ার হবে বলে আহমদ শরীফ মনে করেন।

আহমদ শরীফের সংস্কৃতি চিন্তায় গণমানুষ প্রাধান্য পেয়েছে এবং গণমানুষের মুক্তির জন্য তা তাদেরকে আত্মপরিচয় নিয়ে দাঁড়াতে সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছে। এই চেতনায় নিঃসন্দেহে তিনি বিজ্ঞানমনস্ক। গবেষণায়, বিবেচনায়, বিশেস্নষণে তিনি গণতান্ত্রিক। মানবতন্ত্রে উত্তরণের পথ হিসেবে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর সমর্থন আছে। তাঁর মানবতন্ত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ করতে গিয়েই মূলত সমাজের নির্জীব শক্তিকে তিনি শক্তিশালী করে জাগিয়ে তুলতে তৎপর হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি আপোষহীন। এ আপোষহীন মনোভাব নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রগতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কখনও কখনও সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়াশীলতাকে তিনি উস্কিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সাংস্কৃতিক তৎপরতা অনেকাংশে সাংস্কৃতিক শক্রা সৃষ্টি করে, পরিণতিতে বাড়িয়ে তোলে সমাজ রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতা।

Dhaka University Institutional Repository

লোকসংস্কৃতির উজ্জীবন তিনি চাননি, বিজ্ঞানের অগ্রসরতা দিয়ে তিনি দেখতে পান লোকসংস্কৃতি, অজ্ঞতা কুসংস্কারকে 'মহিমান্বিত' করে। তাঁর মতে, এক হাজার বছরের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে আজকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বড় করে তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে প্রতারণা ও রসিকতাই প্রকাশ পায়। যেহেতু তাঁর সংস্কৃতিচিন্তায় গণসচেতনতা বৃদ্ধির কেন্দ্র গণমানুষ। গণমানুষকে নিয়ে ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হতে চান বলেই তিনি লোকসংস্কৃতির অবসান কামনা করেন। তিনি স্পস্টভাবে বলেন

"....এই ঢাকা শহরেই যাত্রা, জারি, পিঠা, শিকা, তালের পাখা দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এর দ্বারা গণমানুষের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পায় না। আমরা নিজেদের জন্য যা কামনা করি না, অন্যদের জন্য তা কামনা করা আমাদের উচিত নয়। .... এ আয়োজনে প্রতারণা আছে।"[৯৬]

বদরুদ্দীন উমর (জন্ম ১৯৩১)

বদরুদ্দীন উমর সমাজতান্ত্রিক আদর্শে স্থিত। তিনি তাঁর বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দু থেকে মোটেও বিচ্যুত হননা। বিশেষ সেই বিন্দুকে কেন্দ্র করেই তিনি তাঁর কক্ষপথে আবর্তিত হন। সেই সূত্রটি হচ্ছে এই যে, "সংস্কৃতির মূল ভিত্তি ধর্ম, বর্ণ,বংশ ইত্যাদি নয়- সে ভিত্তি মানুষের আর্থিক জীবন।"[৯৭] "বদরুদ্দীন উমর বিগত চার দশক কালের মধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ে অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু সংস্কৃতি বলতে তিনি কি বোঝেন, সেকথা কোথাও যথেষ্ট স্পষ্ট করে বলেননি।"[৯৮]

'যথেষ্ট স্পষ্ট' করেছেন কিনা সে বিতর্কে না গিয়েও দেখতে পাই সংস্কৃতির পরিচয় তিনি দিয়েছেন 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা নামক গ্রন্থে এভাবে-

"জীবন চর্চারই অন্য নাম সংস্কৃতি। মানুষের জীবিকা, তার আহার বিহার চলাফেরা, তার শোক তাপ আনন্দ বেদনার অভিব্যক্তি, তার শিক্ষা সাহিত্য ভাষা, তার দিনরাত্রির হাজারও কাজকর্ম। সবকিছুর মধ্যেই তার সংস্কৃতির পরিচয়।এজন্যে তার সামগ্রিক সংস্কৃতি ও অসংখ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এগুলির মধ্যে কিসের প্রভাব বেশী কিসের কম সেটা নির্ভর করে বিভিন্ন জিনিসের উপর মানুষের নির্ভরশীলতার তারতম্যের উপর। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে আর্থিক অবস্থার গুরুত্বই মানুষের জীবনে সব থেকে বেশী এবং তার দ্বারাই সংস্কৃতি সব থেকে বেশী প্রভাবিত।"[৯৯]

Dhaka University Institutional Repository

এখানে তিনি আর্থিক বুনিয়াদের উপরই যে জীবন যাপনের সামগ্রিক বিষয়ের বিকাশ নির্ভর করে সেই আর্থিক ব্যবস্থাকেই সংস্কৃতির ভিত্তি মনে করেছেন। 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' বইটি প্রকাশের সময় তিনি নিজেকে মার্কসবাদী বলে পরিচয় দেননি কিন্তু যখন থেকে তিনি নিজেকে মার্কসবাদী বলে পরিচয় দিয়ে লিখেছেন, "তখন থেকে যে কোন সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণে তিনি বহুলাংশে এদেশের অপরাপর মার্কসবাদীদের মতই শ্রেণী, শ্রেণীবৈষম্য, শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রেণীচরিত্র ইত্যাদি কথার সাহায্যে নিজের ধারণাকে ব্যক্ত করে থাকেন।"[১০০]

বদরুদ্দীন উমরের চিন্তায় 'সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো আর্থিক জীবন, ভাষা, ভৌগোলিক অবস্থান এবং ধর্ম। এগুলোর ভিত্তিতে সংস্কৃতিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় এবং একই ভাষা, একই ধর্ম ও একই আর্থিক অবস্থার মধ্যেও ভৌগোলিক ব্যাবধান সাংস্কৃতিক পার্থক্য সৃষ্টি করে। জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও উপভোগ সামগ্রী থেকে শুরু করে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যও তৈরী করে। এজন্য তিনি 'সংস্কৃতির সংকট' গ্রন্থে বলেছেন, "সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হিসাবে আর্থিক জীবন অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলেও একমাত্র তার দ্বারাই কোন সংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।"[১০১] তিনি শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 'আর্থিক জীবন' ও 'ভাষা' সংস্কৃতির চরিত্র বিচারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন বাংলাদেশে এই দুটি বিষয়ই তাঁর সংস্কৃতি চিন্তার বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে। আর্থিক জীবনের নৈতিক স্খলন উন্নত সংস্কৃতি সৃষ্টির অন্তরায়। রাজনীতি, অর্থনীতি থেকে শুরু করে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে সে নেতিবাচক প্রভাবে যে সংস্কৃতি বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে তা নিম্নগামী বলে বদরুদ্দীন উমর মনে করেন।

তিনি বাংলাদেশ আমলের সাংস্কৃতিক সংকটকে উন্মোচন করবার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছেন যা এরকম, "দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হলে সাম্প্রদায়িকতা 'বাঙালী সংস্কৃতি'র স্থান দখল করতে চেয়েছিল। কিন্তু 'বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিকে তার ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও এই বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা, সমগ্র মুসলমান বাঙালী সমাজেই খুব গভীর ও ব্যাপক থাকায় রাষ্ট্রীয় চিন্তা

Dhaka University Institutional Repository

কাঠামোর বাইরে তা বহুলাংশে সফল হয়েছিল।"[১০২] এর ধারাবাহিকতা বাংলাদেশ সময়েও ছিল। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি ও উনিশ বিশ শতকের বাঙালী সংস্কৃতির পরিচয় থেকে নতুন প্রজন্ম প্রায় বঞ্চিত। এই ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা জীবন বিচ্ছিন্নতার-ই নামান্তর। প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতা যে সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করেছে তার ফলে সংস্কৃতির বস্তুগত ভিত্তি ও বস্তুগত উপকরণও উপেক্ষার পর্যায়ে। তাঁর মতে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়নি। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত হলো আওয়ামী লীগের ছিল 'সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতাবোধ' আর "এ কারণেই পাকিস্তানী আমলে যে সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার নীতি সরকারীভাবে কার্যকর করার চেষ্টা হতো মূলত সেই নীতিই বাংলাদেশ আমলে, বাঙালীদের রাজত্বে, প্রথমে আওয়ামী লীগ এবং পরে জিয়াউর রহমান, এরশাদের সামরিক সরকার ও পরবর্তী সরকারগুলির মাধ্যমে শাসক শ্রেণী বলবৎ রেখেছে।"[১০৩]

এই সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার সূত্র ও সংকটের উৎস বদরুদ্দীন উমর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্বে 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' ও 'সংস্কৃতির সংকট' গ্রন্থে নির্ণয় করেছেন। আর বাংলাদেশ সময়ে তাঁর সমীকরণকে মিলিয়ে দেখেছেন।

449600

তাঁর এ রাজনৈতিক সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে প্রকৃত মার্কসবাদ চর্চার প্রয়াস। এক্ষেত্রে তাঁকে অনেকেই চরমপন্থী কমিউনিস্ট বলেও অভিহিত করেছেন। জীবন ও জীবিকার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রভাব মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনেও পড়ে। শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে তিনি বঞ্চিত কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবসান হবে এবং লোকায়ত সংস্কৃতি বিকশিত হবে বলে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছেন। এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশ বুর্জোয়া নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ করেছে। এবং যেহেতু বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশ সেজন্য বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা চিন্তার জগতে রয়ে গেছে, জন সংলগ্নতা লাভ করতে পারেনি। তাই দেখা যাচ্ছে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা, চিন্তার ইতিহাস হয়ে আছে, বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতিতে তেমন একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ফলে বদরুদ্দীন উমরের সংস্কৃতি চিন্তা মার্কসীয় দৃষ্টিতে বাঙালি সমাজ সংস্কৃতির বিশ্লেষণ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (জন্ম ১৯৩৬)

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নিকট "সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জীবন যাপনের পরিচয়, সেই পরিচয়ের অভ্যন্তরে থাকে বিজয়- পরিবেশের উপর এবং প্রকৃতির উপর।"[১০৪] তিনি মনে করেন, মানুষের ভেতর ও বাইরের প্রকৃতিকে জয় করবার মধ্য দিয়ে সমবেতভাবে এবং স্বাধীনভাবে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে। এভাবেই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির যাত্রা শুরু হতে পারে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রধান দুটি শর্ত তিনি নির্ধারণ করেছেন- স্বাধীনতা ও মৈত্রী। "স্বাধীনতাই প্রথম" এবং সেই স্বাধীনতা ব্যক্তির। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি সবই প্রয়োজন ব্যক্তিকে স্বাধীন করবার লক্ষ্যেই, ব্যক্তি স্বাধীন না হলে সব স্বাধীনতাই অর্থহীন ধ্বনি মাত্র, একেবারেই অন্তঃসারশূণ্য।"[১০৫] ব্যক্তির এ স্বাধীনতা ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে না বরং মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করে। ব্যক্তিকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবার জন্য পুঁজিবাদী আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতির ক্ষতগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। পুঁজিবাদী সংস্কৃতির বিকাশে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির চাকা কীভাবে ঘুরাচ্ছে তার অনুপুঙ্খ বিশেস্নষণ আছে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর রচনায়। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অগ্রগতির প্রতিবন্ধক সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি। এ সম্পর্কে তার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কথা তুলে ধরা যায়- "...এখানে সংস্কৃতি হবে গণতান্ত্রিক, অর্থাৎ সে হবে একই সঙ্গে সামন্তবিরোধী ও পুঁজিবাদবিরোধী। জাতীয় বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়বেন, সামন্তবাদের অবশেষগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং সমাজ এগুবে সমাজতন্ত্রের দিকে।"[১০৬]

কিন্তু তা হলো না সাম্রাজ্যবাদের কাছে জাতীয় বুর্জোয়ারা আত্মসমর্পণ করেছে আমরা আবারও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ফিরে গেলাম। আর পুঁজিবাদ যে উন্নতির সোপানে নিয়ে গেছে তা বাহ্যিক অবয়ব পরিবর্তন মাত্র। "...তা উপরকাঠামো বটে, ভেতরের কাঠামো সেই আগের মতোই রয়ে গেছে।"[১০৭] আকাশ সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছে, অথচ শিল্পের বিকাশ অত্যন্ত সীমিত হচ্ছে, পুঁজির সঞ্চয়ণ ও বিনিয়োগ বাড়ছে না যা বাড়ছে তা হলো বৈষম্য। বৈষম্য বৃদ্ধির জন্য মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষের মনে হতাশা বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি ভোগবাদিতাকে উৎসাহিত করছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির অবাধ বাণিজ্যের আন্তর্জাতিকতা আজ গ্রাম-গঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। পুঁজিবাদের বিকাশও এখানে স্বাভাবিক নয়, বিকৃত। "পুঁজিবাদের সব বিকৃতি এখানে পাওয়া যাবে, কিন্তু পাওয়া যাবে না তাঁর উদ্যম ও সৃষ্টিশীলতা।"[১০৮]

পুঁজিবাদের এই বিকৃতিজাত সংস্কৃতি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের মোকাবেলা করা ও সামন্তবাদের চিহ্ন মুছে দেওয়া সম্ভব নয়, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তাঁর সম্পর্কে "একটি বড় অভিযোগ যে তিনি নেতিবাচক দৃষ্টিপ্রবণ, উল্টোপথের অভিযাত্রী। সামাজিক অসঙ্গতি কিংবা শিল্প সাহিত্যের ক্ষতিকারক দিকগুলির প্রতি আঙ্গুলী নির্দেশ করে মানুষকে ওয়াকিবহাল করে দেয়ার কাজটি নিঃসন্দেহে সদর্থক। কিন্তু তার পাশাপাশি প্রতিকারসূচক পরামর্শ বা ইতিবাচক কোন ছবি যদি তুলে ধরা সম্ভব না হয়, তবে একজন বুদ্ধিজীবীর যথার্থ দায়বদ্ধতা প্রমাণিত হয়না।"[১০৯]

এক্ষেত্রে তিনি বর্তমান নিয়ে সমালোচনার পাশাপাশি ভবিষ্যতের রূপরেখাকে জীবন্ত করে হয়তো তুলতে পারেননা কিন্তু তাঁর চিন্তার মূলে থাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা, তাই সমস্যাকে তুলে ধরতে গিয়ে নেতিবাচকতার প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক নয়। একথাটি বিবেচনায় রেখে অগ্রসর হলে দেখা যায় তাঁর চিন্তায়, স্বপ্ন ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত মেলে তবে তা উদ্ভাসিত সমস্যার অন্তরালে ঢাকা পড়ে থাকে। বাম নেতৃত্বের ব্যর্থতা, বুর্জোয়া নেতৃত্বের নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতির সমাজতান্ত্রিকায়নে প্রত্যাশী। তিনি জানেন সমাজতন্ত্রের পথ সহজ নয়, স্বাভাবিকও নয়। তারপরও সমাজতন্ত্রই তাঁর লক্ষ্য। লক্ষ্যে পৌঁছতে তিনি গণতন্ত্রের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চান। এ সম্পর্কে 'বিকল্প কি' প্রবন্ধে বলেছেন- "সমাজতন্ত্র এখনই এসে যাচ্ছে না, আপাতত: আমরা গণতন্ত্র পেলেই খুশি। কিন্তু গণতন্ত্র এদেশে তারাই আনতে পারবে যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, অন্যরা ক্ষমতায় যাবে এবং আসবে, কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করবে এমন ভরসা নেই। তারা ক্ষমতা চায়, গণতন্ত্র চায় না।"[১১০]

তিনি গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রের বিকল্প মনে করেননি কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজের দ্বন্দ্বের নিরসন হবে সমাজতন্ত্রীদের হাতে, এ সম্পর্কে ভবিষ্যতের রূপরেখা তিনি নির্ধারণ করেছেন 'গতকাল এবং আগামীকাল' প্রবন্ধে:

Dhaka University Institutional Repository

"আগামী শতাব্দীতে পুঁজিবাদ-বিরোধী আন্দোলন আরও শক্তিশালী হবে। কেননা, বাগান, যা মানুষের হাতে তৈরী, যাতে দেখা যাবে বৈচিত্র আছে, বৈষম্য নেই; সেখানে মানুষ দৈত্যের মত আচরণ করবে না, আচরণ করবে মানুষের মত। এই আন্দোলনকে সমাজতান্ত্রিকই হতে হবে। কেননা, পুঁজিবাদের বিকল্প পশ্চাদপদ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সামন্তবাদ নয়; বিকল্পটা হচ্ছে অগ্রসর ও আলোকিত সমাজতন্ত্র। কিন্তু এই আন্দোলন এককেন্দ্রিক হবে না, কেননা প্রত্যেক জাতিকেই বৈষম্যের সমস্যার মীমাংসা করতে হবে নিজস্ব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং সেই মীমাংসায় বিশ্ব পুঁজিবাদের পতন ঘটবে, ছিন্ন করবে সে ওই ব্যবস্থার বৈষয়িক ও আদর্শিক শৃঙ্খল।"[১১১]

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জন্ম বগুড়ায় ১৯৪৩ সালে। তাঁর শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে বগুড়া ও পুরনো ঢাকায়। ছাত্র জীবনের বাকী সময় ও কর্ম জীবনের অধিকাংশ কাল কেটেছে পুরনো ঢাকায়। ইলিয়াসের বাবা রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলেও "ইলিয়াস কোন রাজনৈতিক দলে নিজেকে অন্তর্ভূক্ত করেননি। এমনকি বাবার রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারীও ছিলেন না তিনি। তবে প্রখর রাজনৈতিক চেতনা তাঁর শিল্পীসত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ছিল। অসাম্প্রদায়িক চেতনা, প্রগতিভাবনা, শোষনমুক্ত সমাজচিন্তা, নিম্নবর্গীয় জীবনের প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতি ছিল তাঁর জীবনাদর্শের অংশ।"[১১২] "মানস গঠনের দিক থেকে ইলিয়াস Introvert এবং extrovert দুটোই।"[১১৩] লেখক জীবনে তিনি Introvert এবং বহির্জীবনে extrovert এই দুইটি বিশিষ্ট গুণের সমন্বয়ে তাঁর চিন্তায় এসেছে স্বাতন্ত্র্য এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীরতা। ব্যক্তিত্বে এই পরস্পরবিরোধী দ্বৈতপ্রবণতা ধারণ করা একজন বড় শিল্পী না হলে কখনো সম্ভব নয়। সমাজ সংসারকে জীবন দিয়ে দেখার অভিজ্ঞতা অন্তরউপলব্ধি দিয়ে প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর রচনায় সাধারণ মানুষের স্থান-ই হচ্ছে বড়। তাঁর সংস্কৃতি চিন্তায় স্থান পেয়েছে গণমানুষের জীবনাচরণের কথা।

"উপনিবেশবাদী শাসনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং তাদের সংস্কৃতি ও শালীনতা-অশালীনতাবোধ এই উভয়কেই তিনি উত্তর উপনিবেশী মনস্তত্ত্ব দ্বারা আঘাত করতে চান।"[১১৪] এজন্যই তিনি মধ্যবিত্তের নিজের গড়া সংস্কৃতির অহংকে আঘাত করেন এবং ভেঙ্গে ফেলতে চান। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিন্নতর রূপের দিকে শেকড়

Dhaka University Institutional Repository

সন্ধানী হয়ে ওঠেন।এই বাস্তবতাবোধের স্বরূপ তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাঁর ভাষায় :

"আমি নির্দিষ্ট কোন Philosophy মাথায় রেখে Reality দেখি না। Reality-কে আমি ভেতর থেকে দেখতে চাই।... Reality মানে যা দেখতে পাচ্ছি কেবল তাই নয়। এর ভেতরকার স্বপ্ন, সাধ, সংকল্প, সংস্কার, কুসংস্কার সবই Reality-র ভেতরকার Reality...আমি Reality-র ভেতরটা দেখতে চাই। আমি আমার কোন Idea এর উপর চাপিয়ে দিতে চাইনা। সেটা হবে Wishful thinking. আর Wishful thinking is a thing I am the last person to go with. এতকাল আমাদের কম্যুনিস্ট Writer-রা এই Wishful thinking-ই করে এসেছে। তারা শ্রমিককে মহৎ মানুষ হিসেবে দেখিয়েছে। তার মানে সে আসল শ্রমিককে disown করলো, refuse করলো।...এটা হচ্ছে reality কে betray করা চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয়।"[১১৫]

বাংলাদেশের সংস্কৃতি চিন্তায়, আত্মানুসন্ধান ও জাতিসত্তার স্বরূপ সন্ধানী আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সংস্কৃতিভাবনার স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু ' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে। এই গ্রন্থের 'লেখকের দায়' প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, "বাংলাদেশে এখন চলছে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে মধ্যবিত্তের বিচ্ছেদ-প্রক্রিয়া। ফলে আমাদের সংস্কৃতির বুনিয়াদ চলে যাচ্ছে আমাদের চোখের আড়ালে।"[১১৬] এই কঠিনকে ভালবাসার শক্তি তিনি পেয়েছিলেন ১৯৫২ এর একুশে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে। কারণ পূর্ববর্তী কোন সংগ্রাম নয় "...২১ শে ফেব্রুয়ারী গোটা জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করলো একটি অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের দিকে, ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী নিজেদের অনুভব করতে লাগল একটি জাতি হিসাবে কিংবা জাতি হিসাবে নিজেদের পরিচয় অনুসন্ধানে নিয়োজিত হল।"[১১৭] এই আন্দোলনের লক্ষ্য কখনই বাংলাভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তাই পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাবার পরও যতবার একুশে ফেব্রুয়ারী এসেছে ততবারই বাঙালি আত্মপরিচয় সন্ধান করে নতুন যুগের ও নতুন সময়ের দাবী অনুযায়ী। তাঁর মতে একুশে ফেব্রুয়ারি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয় এবং তা ঘোরতরভাবে প্রতিষ্ঠানবিরোধী। একুশে ফেব্রুয়ারি তাই নতুন প্রজন্ম ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে শুধু স্মৃতিচারণ নয়। "....এটা তাদের কাছে নিজেদের যৌবনের মত, এখানে তারা নিজেদের শক্তি অনুভব করার শক্তি অর্জন করে। ২১ ফেব্রুয়ারী তাদের কাছে কেবল একটি

Dhaka University Institutional Repository

দিনমাত্র নয়, এটা একটা ঋতু যার শুরু কখনো কেউ বুঝতেও পারেনা এবং শেষ এ-পর্যন্ত দেখা যায়নি।"[১১৮]

ষাট এর দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রানিত এবং ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও মহান মুক্তিযুদ্ধে আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে করেছে সাধারণ মানুষের প্রতি আস্থাশীল। তাঁর চিন্তায় নায়কের স্থান জনতার। জনসংস্কৃতিই তাঁর সংস্কৃতি চিন্তার মূল কেন্দ্র। তিনি বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে শেণীবিভাজনের বাস্তবতার আলোকে সংস্কৃতিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' নামক প্রবন্ধে তিনি এই তিন ভাগ ধরে আলোচনা করেছেন। "প্রথমত, অপসংস্কৃতি; দ্বিতীয়ত, বাঙালি সংস্কৃতি; সবশেষে, নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী সংস্কৃতি।"[১১৯] 'অপসংস্কৃতি বলতে তিনি মধ্যবিত্তের একাংশের সংস্কৃতিচর্চার চিত্র তুলে ধরেছেন। যারা নিজেদের সামাজিক ও শ্রেণীগত অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। এবং তারা পয়সার জোরে সমাজের যে কোন স্তরে ওঠার বাসনা থেকেই স্বপ্ন দেখে। এই পর্যায়েই তারা জীবন যাপন পদ্ধতি পাল্টাবার প্রয়োজন অনুভব করে। বুর্জোয়া মূল্যবোধ ও মানসিকতা যদিও এই শ্রেণীর ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে তবুও স্বাভাবিকভাবেই তারা ঐ ধারার জীবনযাপনকেই অনুকরণ করে। বুর্জোয়া মূল্যবোধকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও এ ধরনের পরস্পরবিরোধী কার্যকলাপ ও দ্বন্দ্ব থেকে যে সংস্কৃতি জন্ম লাভ করে তাকে 'অপসংস্কৃতি' বলে তিনি অভিহিত করেছেন। এজন্যই তিনি বলেছেন, "...এদের জীবন তাই নিরালম্ব, এই জীবনের ভিত্তিবিন্যাস ও তাৎপর্য খুঁজে বের করা খুব কঠিন।' এদের সংস্কৃতিও যে নিরালম্ব ও উটকো ধরণের হবে এতে আর সন্দেহ কি?"[১২০] আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অনুসন্ধানী চোখ তাই শেষ পর্যন্ত সত্য খুঁজিয়া লইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ ও জীবনযাপন এক নহে। এই বিরোধ হইতেই জন্মিয়াছে 'অপসংস্কৃতি' নামে কথিত দানবটি। ইলিয়াসের সংজ্ঞা অনুসারে "সামন্ত ও গ্রাম্য মূল্যবোধের বুর্জোয়া জীবনযাপনের সঙ্গে এই উৎকট মাখামাখির ফলে যে সংস্কৃতি গজিয়া ওঠে তাও অনেকের চোখে উটকো ঠেকে এবং তখন তাকে অপসংস্কৃতি বলে গাল দেয়া হয়।"[১২১]

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালী সংস্কৃতি বলতে যা বোঝানো হয় তাও তাঁর মতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মানেইতো জাতি। জনগণ হতে বিচ্ছিন্নতা মানে জাতি থেকেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং মধ্যবিত্তের এই অংশের সংস্কৃতিও বাঙালি সংস্কৃতি নয়। তিনি বলেছেন, "যাকে বাঙালী সংস্কৃতি বলে ঢাক পেটানো হয় তা যদি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কর্মপ্রবাহ ও জীবনযাপন থেকে প্রেরণা নিতে না পারে তো তাও অপসংস্কৃতির মতো উটকো এবং ভিত্তিহীন হতে বাধ্য। তার বাইরের চেহারা যতই 'রুচিশীল হোক' তাতে ঘষামাজা ভাব যতই থাকুক, তা রক্তহীন হতে বাধ্য।"[১২২] মধ্যবিত্তের এই দুই অংশের এক অংশ পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিকারপ্রাপ্ত অবস্থায় আরেক অংশ বুর্জোয়া সংস্কৃতির কেন্দ্রে অবস্থিত। উভয়ই অপসংস্কৃতি। বুর্জোয়া সংস্কৃতি বা মধ্যবিত্ত বাঙালী সংস্কৃতি তাঁর নিকট, "একঘেঁয়ে ও প্রাণহীন নিস্পন্দ অভ্যাস বিশেষ। এই দুর্দশা থেকে উত্তরণের জন্য বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের উপরও তিনি নির্ভর করতে পারেননি। তারা ১৯৬৯ সালের ব্যাপক গণআন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি কারণ 'শ্রমজীবীদের সঙ্গে বামপন্থী কর্মীদের সাংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা দূর করতে না পারলে শ্রমজীবী মানুষের আস্থা ও আত্মীয়তা লাভ করা অসম্ভব।"[১২৩]

মধ্যবিত্তের সংস্কৃতিচর্চার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি আর শ্রমজীবীর সংস্কৃতিচর্চার উৎস তার জীবিকা। একটা প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত, আরেকটা সৌন্দর্যচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ। শ্রমজীবীর সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন; "দারিদ্র যেমন শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁদের একই মানের জীবন যাপন করতে বাধ্য করে, সংস্কৃতিচর্চাও তাদের একটি পর্যায় থেকে নতুন ধাপে উঠতে হোচট খাচ্ছে।"[১২৪] কিন্তু শ্রমজীবীদের সাথে মধ্যবিত্ত বামপন্থীরা এ ব্যবধান কাটিয়ে উঠতে পারেন, যদি তারা নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারেন এবং গভীরভাবে ভালবাসার সাথে তাদেরকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে পারেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ এই শ্রমজীবীদের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথে নিষ্ঠাবান শিল্পীও এগিয়ে আসতে পারেন। তাঁরা যদি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতিকে শুধুমাত্র সংরক্ষণ ও প্রদর্শনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, তাদের সাংস্কৃতিক জীবন ও চরিত্র সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে পারেন তবেই তাদের বিকাশের পথ সুগম হবে। এজন্যই তাঁর সংস্কৃতি ভাবনার ব্যাপ্তি বাংলাদেশে বসবাসকারী শুধু বাঙালি জনগোষ্ঠীর

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি বাংলাদেশ ভূখন্ডে বসবাসকারী অন্য ভাষাভাষী জাতিগুলোকে নিয়েও সংস্কৃতি গঠনের চিন্তা করেছেন যা তাঁর সংস্কৃতি ভাবনাকে স্বাতন্ত্র্য মন্ডিত করেছে। জাতীয় সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আধিবাসীদের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি নিয়েও তিনি ভেবেছেন এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাহিত্যের মধ্যে 'চাকমা উপন্যাস' এর দাবী তুলে বলেছেন "চাকমা ব্যক্তির উদ্বোধন টের পাই তার তীব্র অপমান বোধের ভেতর, আর স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে এবং তার পরিচয় প্রতিষ্ঠার সংকল্পে।"[১২৫]

'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' প্রবন্ধগ্রন্থে জাতীয় সংস্কৃতি গঠনে যে আন্তঃসম্পর্ক প্রয়োজন, তার অনুপস্থিতির সংকেত গ্রন্থের নামের সাথেও ধক্ষনিত হয়েছে। বাংলাদেশের শ্রেণীবিভাজনের ভাঙা সেতু দিয়ে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। 'জাতীয় সংস্কৃতি' কথাটির নামোল্লেখ বা সংজ্ঞা প্রদান না করায় সলিমুল্লাহ খান তাঁর স্ববিরোধী অবস্থান নির্দেশ করে বলেছেন- "আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সংস্কৃতি চিন্তা বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যবিত্ত অবদেবতা আক্রান্ত।"[১২৬] এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে, শ্রমজীবীদের সংস্কৃতি সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং যারা জাতীয় সংস্কৃতির মূল অংশ, তাদের অবস্থান শেষ পর্যন্ত কোথায়? তিনি ইলিয়াসের সত্তার কাছে ফিরে গিয়েছেন, তাঁরই কথায় তিনি উত্তর দিয়েছেন, "মধ্যবিত্ত সমাজে শিল্পীর প্রধান উদ্দেশ্য যদি সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় 'তখন মনে হয় তিনি সৌন্দর্য সৃষ্টির কোন ভাগ নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীকে দিতে রাজী হইতেছেন না।"[১২৭]

"ইলিয়াসের আদর্শ 'ব্যক্তি' আসলে দ্বিধাবিভক্ত, দ্বৈতসত্তার : বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নায়ক আবার, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথিকৃৎ-ও। গোলটা ঠিক এখানেই। ইউরোপীয় সমাজ আখ্যানের মডেল-নির্ভর ধারাভাষ্য অনুযায়ী: প্রথমজনকে এড়িয়ে গেলে দ্বিতীয়জনের সাক্ষাৎ পাওয়া ভার; প্রগতির পর্যায়ক্রম, সামাজিক বিবর্তনের রূপরেখা উপেক্ষা করে ধনতন্ত্র টপকে সমাজতন্ত্রে পৌছানোর চেষ্টা, হঠকারিতার সামিল। ঐ বিধির বাঁধন পশ্চিমের উপহার; কাটে কার সাধ্য! আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতন শক্তিমান লেখকও সবসময় তা পারেননি; ধারাবিবৃতির ধোঁয়াশা কোথাও কোথাও তাঁকেও আচ্ছন্ন করেছে।"[১২৮]

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)

আহমদ ছফা সংস্কৃতির কোন প্রথাগত সংজ্ঞা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। তিনি 'বাঙালি মুসলমান সংস্কৃতি' সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা করেছেন। যে বাঙালির ভূখন্ড বাংলাদেশ। ''যারা বাঙালী এবং একই সঙ্গে মুসলমান তারাই বাঙালী মুসলমান।''[১২৯] এ সম্পর্কে তিনি ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিচার করে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগ হয়ে আধুনিক বাঙালি জীবনের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে বাঙালির মনন সাধনা তার সবকিছুকেই বাঙালির ঐতিহ্য বলে মেনে নিয়েছেন। শুধুমাত্র ''ধর্মগত, সম্প্রদায়গত, দেশগত সংকীর্ণতার বেঢপ চশমা এটে অতীতের পানে তাকাবার প্রয়োজন বাংলাদেশে অবসিত। তবে বাংলার ইতিহাসে যারাই যা-ই করুক, কল্যাণ দৃষ্টির স্পর্শে মানবীয় অংশটুকু আপনার নিজের বলে দাবী করতে পারবে বাঙালী।''[১৩০]

বাংলার এই নতুন ইতিহাসের প্রয়োজন কেন? এ প্রশ্নটি তাঁর সংস্কৃতিচিন্তায় সুনির্দিষ্ট উত্তর খুঁজে পেয়েছে। কারণ বাঙালি ইতিহাস তৈরী করার জন্য মন তৈরী করে রাখলেও ইতিহাস তৈরী করার সুযোগ পেয়েছে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। এ সময়ের যা কিছু অর্জন তা বাঙালির নিজস্ব। ইতিহাসের এ পর্যায়ে বাঙালি মৃত্তিকার সন্তানরূপে নতুন করে জন্ম নিয়েছে। ১৯৫২ থেকে তারা ইতিহাসের ধারাকে প্রবাহিত করেছেন নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যা ১৯৭১ এ সফল পরিণতি পেয়েছে। এই সময় পরিসরে বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, নারী পুরুষ, লেখক শিল্পী এবং সর্বস্তরের মানুষ সক্রিয়ভাবে ইতিহাস সৃজনের নতুন গতিবেগ এনেছে। তাই ''বাংলার জনগণই বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে এবং বাংলার জনগণই তার সমাজ বিন্যাসে রূপান্তর আনবে। এই সাধারণ মানুষরাই এখন বাংলার ইতিহাসের নায়ক।''[১৩১]

কিন্তু এই সাধারণ মানুষের পরিচয় নতুন। তারা বাঙালি মুসলমান। এ সত্যটি তিনি বুঝিয়ে বলেছেন যে, ''আমি বাঙালী মুসলমান বাঙালীর জাতি ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছে এই কথাটি বলে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দাবি খারিজ করিনি। বাংলাদেশে সংখ্যাধিক

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ মুসলমান এবং মুক্তিযুদ্ধে তাদের ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য, সে কথাটি মনে রেখে বলেছি বাঙালী মুসলমান একটি বাঙালী জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো এই জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টিতে কোন ভূমিকা পালন করেনি সেকথা আদৌ সত্য নয়।"[১৩২]

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বাংলাদেশী রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক সীমানা ও ইতিহাসচেতনা আহমদ ছফার সাংস্কৃতিক চেতনার ভিত্তি। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। দুই বাংলার মানুষের মধ্যে একই ঐতিহ্য, একই সংস্কৃতি, জাতিতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য একই ধরণের হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন। যেহেতু পশ্চিম বাংলার সাথে সাংস্কৃতিক লেনদেন শুরু হয়েছে এবং এর পূর্বেও বাংলাদেশের মানুষ পশ্চিমবাংলার সাথে একটি প্রদেশের অধিবাসী হিসেবে একসঙ্গে বসবাস করেছে সুতরাং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বার্থেই সচেতনতার সাথে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন :

"...শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে ধরনের ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং কষ্টভোগ করতে হয় একটি প্রবল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ তার বেশ খানিকটা লাভ করেছে।... বাংলাদেশের মানুষ আত্মশক্তিতে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী আস্থাশীল হয়ে উঠছে।...বাংলাদেশের সংস্কৃতি তুলনামূলকভাবে অনেক দূর ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি, কিন্তু একথা পশ্চিম বাংলা সম্বন্ধে বলা যায় না।"[১৩৩]

তিনি আরও বলেছেন বাংলাদেশ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বাঙালি মুসলমানের মনের নানা ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আহমদ ছফা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে নানা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তিনি 'বাঙালী মুসলমানের মন' গ্রন্থে 'একুশে ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' বাহাত্তর' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন

"....প্রয়োজনের তাগিদেই বাঙালীকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সংস্কৃতি, ইতিহাস দর্শনেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতেই হবে।"[১৩৪] এজন্য তিনি নতুন সরকারের কাছে, সমাজতন্ত্র,গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা কায়েমের জন্য বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার স্বাধীনতার প্রশ্নে গ্যারান্টি চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৯৫ সালে একই গ্রন্থের 'উত্তর ভূমিকা' লিখতে গিয়ে অভিজ্ঞতাপ্রসূত পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন এভাবে: "আওয়ামী লীগের আন্দোলন যতই বেগ এবং আবেগ সঞ্চয় করেছে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাদের নেতৃত্ব কবুল করে নিয়েছিল। কিন্তু সমাজের ভেতর তারা

Dhaka University Institutional Repository

কোন নতুন মূল্যচিন্তার জন্ম দিতে পারেনি; নতুন সংস্কৃতি নির্মাণ করতে পারেনি। তারা সেক্যুলারিজমের নীতিকে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।"[১৩৫]

এজন্য তিনি বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্বহীনতাকেও চিহ্নিত করেছেন। ১৯৭২ সালের শেষদিকে তিনি 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' গ্রন্থে বুদ্ধিজীবীর সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

'বাঙালী মুসলমানের মন' গ্রন্থে তিনি বাঙালী মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতার প্রেক্ষাপট সামাজিক ইতিহাস ও মনবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। বাঙালী মুসলমানরা ইতিহাসের আদি থেকেই নির্যাতিত একটি জনগোষ্ঠী ছিল এবং তারা কখনো রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করার অধিকার পায়নি। মূলত সেজন্যই তাদের উল্লেখযোগ্য কোন কীর্তি ছিল না। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে তারা নিজেরাই নিজের সমাজে রূপান্তর ঘটাতে পারবে। তাদের সংস্কৃতি হবে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক। এই সংস্কৃতি গড়ে ওঠার জন্য বাঙালি মুসলমানের যুগোপযোগী মানসিক গঠনও হবে নতুন যুগের, নতুন ইতিহাসের চালিকা শক্তি। "পৃথিবীর ভাবপ্রবাহ, কর্মপ্রবাহ এবং বিজ্ঞানচেতনা বাংলাদেশের চিত্ততল সিক্ত করে তুলেছে, হাতকে নিখুঁত করেছে এবং বুদ্ধিকে শুদ্ধ ও বস্তুঘেঁষা করেছে। বাঙালী সমাজ ও বিশ্বের মানব সমাজের এক অংশ এই পরিচয় এবং বাঙালীর যে একটি স্বকীয়তা রয়েছে সে পরিচিতি ও তার পেছনের কাহিনী তুলে ধরার সময় এসেছে এবং তা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে।"[১৩৬]

এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটি আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবার দায়িত্ব সাধারণ মানুষের। " 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' গ্রন্থে তিনি ব্যাপক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নমধ্য শ্রেণীভুক্ত জনগনের জীবনকে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত করেছে তারও কতগুলো মূল সূত্রের সন্ধান করেছেন।"[১৩৭] কোন দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অগ্রগতির সাথে গভীরভাবে জড়িত। একথা বিবেচনায় ধরেই তিনি উপলব্ধি করেন যে, "বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন, শুনলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। এখন যা বলছেন শুনলে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হবেনা।"[১৩৮] আর পরিবর্তন না হবার আশঙ্কায় তিনি নতুন উপায় অন্বেষণ করেছেন 'একুশে ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' বাহাত্তর' প্রবন্ধে এভাবে- "প্রধান মন্ত্রীর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, যদি অসুবিধা না হয় আমাদের সংস্কৃতির প্রাক্তন মুরুব্বিদের কূটনৈতিক দায়িত্ব দিয়ে বিদেশ পাঠিয়ে দিন। দেশে থাকলে তাদের ক্লান্ত মন্ত কগুলো আবার সক্রিয় হয়ে উঠবে। যাবজ্জীবন ধরে সাম্প্রদায়িকতার বেসাতি করে যাদের নাম-ধাম-খ্যাতি এবং পদোন্নতি, তারা যদি পুরনো আসনগুলোতে নড়ে চড়ে ফের বসেন তাহলে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভরাডুবি হবে।"[১৩৯]

এই তিন শ্রেণী ছাড়াও বাংলাদেশে এমন কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তক রয়েছেন তাঁদের চিন্তা-চেতনায় বিশেষ কোন সুনির্দিষ্ট মত ও পথের প্রতিফলন ঘটেনি। তবে তাঁদের চিন্তায় স্থান পেয়েছে জনমুখিতা, মানবতাবাদ এবং বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রশ্নে সংস্কৃতি বিষয়ে আন্তরিক মতামত। এ ধারায় উল্লেখযোগ্য চিন্তকদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আবুল কাসেম ফজলুল হক।

আবুল কাসেম ফজলুল হক (জন্ম ১৯৪৪)

উনিশ শতকে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে কালচার ধারণাকে আত্মস্থ করে বাঙালী ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে বাঙালির যে চিন্তা চর্চার সূচনা ঘটে, আবুল কাসেম ফজলুল হক সে বিকাশমান ধারার সর্বাধুনিক ব্যক্তিত্ব। তিনি রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বেগম রোকেয়া, মোহাম্মদ লুতফর রহমান, এস ওয়াজেদ আলী, কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহের হোসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, গোপাল হালদার, নীহাররঞ্জন রায়, আবুল ফজলের চিন্তা ধারা অনুসরণ করেছেন। যদিও এই ধারাবাহিকতার মধ্যে সংস্কৃতির অর্থ সকলের চিন্তায় একরকম ছিলনা। তদুপরি ধর্ম, শিক্ষা, সভ্যতা, অনুশীলন চিত্তোৎকর্ষ, কৃষ্টি, বৈদগ্ধ, চিত্তপ্রকর্ষ, সংস্কৃতি ইত্যাদি ধারণার সারসংকলন করে তাঁর কাছে সংস্কৃতি হল "জীবনের ও পরিবেশের উৎকর্ষ সাধনের ও উন্নতি বিধানের এবং যথাসম্ভব ইচ্ছানুযায়ী ইতিহাসের গতি নির্ধারণের চিন্তা ও চেষ্টা।"[১৪০]

Dhaka University Institutional Repository

এই জীবন ও পরিবেশ যেহেতু একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত সেজন্য জীবন ও পরিবেশের উন্নতি তাঁর একান্ত কাম্য। জীবন (মানুষ)-ই পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে, সুন্দর করে, উন্নত ও সমৃদ্ধ করে সেজন্য তিনি বলেন:

"...জীবন যাত্রার মধ্য দিয়ে মানুষের নিজেকে এবং নিজের পরিবেশকে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও উন্নত করার যে প্রবণতা, চিন্তা ও প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, তারই মধ্যে নিহিত থাকে তার সংস্কৃতি। ব্যক্তির জীবনে যেমন তেমনি সমষ্টির জীবনেও সংস্কৃতিচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃতির মর্মে আছে উন্নত হওয়ার ও সমৃদ্ধ করার প্রবণতা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা। ব্যক্তিগত ও যৌথ জীবনে মানবীয় গুণাবলী ও নৈপুণ্য বৃদ্ধির এবং দূরদর্শিতার সঙ্গে পরিবেশকে উন্নত ও সুন্দর করে তোলার চিন্তা ও চেষ্টারই অপর নাম সংস্কৃতি। সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক আছে রুচি, পছন্দ,দৃষ্টি, শ্রুতি, চিন্তাশক্তি, শ্রমশক্তি, সমাজবোধ আহার্য, ব্যবহার্য, পরিপার্শ্ব, বিবেক-বুদ্ধি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিচারক্ষমতা, গ্রহণ-বর্জন ও প্রয়াস- প্রচেষ্টার। সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ও যূথের কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পরিবেশের সংস্কার, রূপান্তর ও নবজন্ম ঘটে। কোন ব্যক্তির কিংবা জনগোষ্ঠীর উৎপাদনসামর্থ, সৃষ্টিসামর্থ্য,ন্যায়নিষ্ঠা, কল্যাণ চেতনা, সত্যপ্রিয়তা, সৌন্দর্যবুদ্ধি এবং উন্নত ভবিষ্যতসৃষ্টির চিন্তা ও চেষ্টা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তির কিংবা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।"[১৪১]

সংস্কৃতি সম্পর্কে এই চেতনার গভীরে যে বিষয়টি পরিস্কারভাবে উঠে এসেছে তা হল ব্যক্তির ও সমষ্টির মানবীয় জীবন-যাপন ও তার মধ্য দিয়ে সুষম সমৃদ্ধ জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ও যৌথ জীবনের প্রস্তুতি। একজন ব্যক্তি কীভাবে প্রস্তুত হতে পারে বা সমষ্টির মধ্য দিয়ে একটি জাতি কীভাবে প্রস্তুত হতে পারে সে উপায় নির্ধারণ করা ব্যক্তি বা সমষ্টির সংস্কৃতি চেতনার অন্তর্গত। এই উপায় নির্ধারণে তিনি জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়ে জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য স্থির করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "কোন জনসমষ্টির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এবং সেই রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করে তোলার আদর্শই হল জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়তাবাদের মর্মমূলে জাতীয় সংস্কৃতির চেতনা দানা বাধে ও বিকশিত হয়। জাতীয়তাবাদের মর্মমূলে কাজ করে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির চেতনা।"[১৪২]

তাঁর মতে, জাতীয় সংস্কৃতি গঠিত হবে গণতান্ত্রিক উপায়ে। জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। শুধুমাত্র ভোটাভুটির মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়না। "গণতন্ত্রে নেতৃত্বের দিক থেকে সকলের মতকে মূল্য দিতে হয়, জনমত গঠন করতে হয়, এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ

Dhaka University Institutional Repository

মীমাংসা করতে হয়। গণতন্ত্র একই সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ। গণতন্ত্র হল এক একটি রাষ্ট্রে জনগণের মধ্যে মানুষের পারস্পারিক সম্পর্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ, সহযোগিতামূলক সৌহার্দ্যমূলক রূপ।"[১৪৩] তাঁর এই গণতান্ত্রিক ধারণা প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারণার বিপরীত। তাই জনগণকে সম্পৃক্ত করে যে জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ তিনি কামনা করেন, প্রচলিত গণতন্ত্র তা পূরণ করতে ব্যর্থ। তাঁর মতে, সংস্কৃতির এই ব্যক্তি থেকে সমষ্টি এবং সমষ্টি হয়ে জাতীয় রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার পথে রাজনীতির বড় ভূমিকা রয়েছে।

উন্নত রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া উন্নত সাংস্কৃতিক জীবন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের জনজীবনে রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংস্কৃতি চেতনার গভীরে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। মানুষের আর্থিক জীবনে ও মনোজীবনে এ প্রভাব ক্ষতিকর যার ফলে "বাংলাদেশে বাঙালি জাতি আজ এক সার্বিক সাংস্কৃতিক পতনের ধারায় আছে।"[১৪৪] বাংলাদেশকে নিঃরাজনীতিকরণের যে চেষ্টা চলছে তার ধারাবাহিকতায় জনগণের রাজনীতিচেতনাও নিম্নগামী। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশে, রাজনীতিতে ক্ষমতার নগ্ন লড়াই, ইউরো-মার্কিন আধিপত্যবাদীদের চাপিয়ে দেয়া নীতি, এনজিওর অস্বচ্ছ ভূমিকা, প্রযুক্তি ও প্রচার মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণহীন প্রসার যে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করেছে, প্রগতির স্বার্থে সেসবের ক্ষতিকর দিকগুলো তাঁর সংস্কৃতিচিন্তায় চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশের জাতিরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রশ্নে তিনি এগুলোর ক্ষতিকর দিকগুলোকে চিহ্নিত করেছেন এবং প্রতিকারের উপায় অন্বেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি পরমতসহিষ্ণু সাংস্কৃতিক চিন্তার রাজনৈতিক উত্তরণে প্রত্যাশী ও প্রয়াসী। রাজনৈতিক সচেতনতার মাধ্যমে ভিন্নমতকে গুরুত্ব দিয়ে যুক্তি ও বিচার-বিবেচনাপ্রসূত সাংস্কৃতিক উদারতাবাদ ও সমন্বয়বাদের পক্ষে তিনি। এক্ষেত্রে নতুন ও পুরাতনের মধ্যে তিনি কোন বিরোধমূলক ভূমিকা পালনে আগ্রহী নন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, "সব পুরানোই একদিন নতুন ছিল, সব নতুনই একদিন পুরাতন হবে। পৃথিবীতে নতুন ও পুরাতন উভয়েই অস্তিত্বশীল এবং উভয়ের স্কন্ধেই অর্পিত রয়েছে এক একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব। সে দায়িত্ব সম্পাদনা করতেই তাদের অস্তিত্বের সার্থকতা।"[১৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

জীবন ও পরিবেশের উন্নতির মধ্য দিয়ে 'ইতিহাসের গতি নির্ধারণে' তাঁর এই মনোভাব একইসাথে নতুন যুগের ভবিষ্যৎ নির্মানে দায়িত্বশীলতা ও নৈতিকতার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর। সঠিক নেতৃত্ব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির (তথ্য ও জৈব প্রযুক্তি) যথাযথ বিকাশ ঘটিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির উন্নত ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তিনি দেখিয়েছেন। যে প্রযুক্তিঘনিষ্ঠতা মানুষকে চিন্তালস, ইন্দ্রিয়সর্বস্ব, ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করতে শেখায় সে প্রযুক্তি গ্রহনে তিনি সঠিক পরিকল্পনা ও জাতির গ্রহণসামর্থকে বিবেচনা করেন। কারণ সাধারণ জনগণ প্রযুক্তির সাথে খুব বেশী ঘনিষ্ঠ থাকাতে জাতীয় সংস্কৃতিতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'য়ের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তিনি বলেন, "...আমাদের দেশে প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে আমাদের লোকদের দ্বারা এবং তা কার্যকর হবে আমাদের লোকদের দ্বারা- এটাই কাম্য।"[১৪৬] তিনি আরও মনে করেন "উন্নত প্রযুক্তিকে অবশ্যই আমাদের আয়ত্ব করতে হবে।"[১৪৭] এভাবেই জাতীয়তাবাদের শক্ত ভিতের উপর বাঙালি সংস্কৃতি দাঁড়াতে পারবে এবং আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বিশ্বমানব সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাবে।

জাতীয়তাবাদের যৌক্তিক অগ্রগতির প্রয়োজনে তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদকে সম্পুরক ব্যবস্থা হিসেবে অপরিহার্য মনে করেন। জাতীয়তাবাদ যখন আন্তর্জাতিকতাবাদের দিকে যাবে তখন সংস্কৃতি বিষয়ক ধারণার ও সংস্কৃতির প্রকৃতিও পুণর্গঠিত ও নবায়িত হতে হবে। উন্নত জাতীয় সংস্কৃতি অর্জনের জন্য; রাজনীতিতে সংস্কৃতির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায়, রাজনীতিকে জাতীয় ও জনজীবনের উন্নতির উপায় রূপে গড়ে তুলবার জন্য তাঁর সংস্কৃতিচিন্তায় তিনি দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন দেশের সরকার, রাজনৈতিক দল, জনচরিত্র, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, প্রশাসন, শ্রমব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা, ধর্ম-আচার অনুষ্ঠান, শিল্প সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের গতিধারায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

০০১। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বাংলাদেশের প্রবন্ধ*, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১, পৃ.৭৫।

০০২। আবুল মনসুর আহমদ, আত্মকথা, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮৭ পৃ: ২৯১, উদ্ধৃত মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাংলায় চিন্তা চর্চা ১৯৪৭-১৯৭০ দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, অনুপম প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ:১৯৩।

০০৩। আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ:৯৪ ।

০০৪। পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৪।

০০৫। আনিসুজ্জামান, বাংলাদেশ, বাঙ্গালি ও বাংলাদেশী, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, অন্যপ্রকাশ, ২০০০, পৃ:১৩৪।

০০৬। আবুল মনসুর আহমদ, *শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা, ১৯৭৩ পৃ: ১ উদ্ধৃত আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত।

০০৭। আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০০০, পৃ: ৬৩৪।

০০৮। আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৫।

০০৯। সৈয়দ আবুল মকসুদ, 'আবুল মনসুর আহমেদ', *বাঙালি জাতি বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ*, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৮, পৃ: ১১২, ১১৩।

০১০। আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার*, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫১।

০১১। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫২।

০১২। পূর্বোক্ত, পৃ: ২১।

০১৩। পূর্বোক্ত।

০১৪। পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫।

০১৫। পূর্বোক্ত।

০১৬। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩০।

০১৭। পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৪, ৯৫।

০১৮। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ২০০০, পৃ:২২০।

০১৯। আবুল ফজল, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, 'ভূমিকা অংশ', সম্পাদক মাহবুবুল হক, সময় প্রকাশন, ২০০১, পৃ: ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

০২০। পূর্বোক্ত, পৃ: ৮।

০২১। যতীন সরকার, 'মানবতন্ত্রী আবুল ফজল ও তার রাঙ্গাপ্রভাত', *আবুল ফজল (ব্যক্তি স্বরূপ ও সাধনা)*, সম্পাদক আবুল হাসনাত, মুক্তধারা, ১৯৮৭, পৃ: ১২৯।

০২২। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩২।

০২৩। আবুল ফজল, *নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮১ পৃ: ৩।

০২৪। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *আবুল ফজল (ব্যক্তি স্বরূপ ও সাধনা)*,পূর্বোক্ত পৃ: ৭০।

০২৫। আবুল ফজল, *সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, 'সংস্কৃতি', মুক্তধারা, ১৯৭৪, পৃ: ৩২।

০২৬। পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩।

০২৭। আবুল ফজল, 'সংস্কৃতি', *মানবতন্ত্র*, মুক্তধারা ১৯৭২ পৃ: ৪২, ৪৩।

০২৮। পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৪।

০২৯। আবুল ফজল, 'সংস্কৃতি প্রসঙ্গে', *শুভবুদ্ধি*, মুক্তধারা ১৯৭৯ পৃ: ৪০।

০৩০। পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৫।

০৩১। এনামুল হক, *আবুল ফজল (ব্যক্তিস্বরূপ ও সাধনা)*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪১।

০৩২। উদ্ধৃত মোরশেদ শফিউল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১।

০৩৩। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'জীবন পথের যাত্রী সাহিত্যিক আবুল ফজল,' *আবুল ফজল (ব্যক্তি স্বরূপ ও সাধনা)*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯১।

০৩৪। আলাউদ্দিন আল আজাদ, *সম্পাদিত আবুল ফজল রচনাবলী* ১ ,(ভূমিকা অংশ), বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ: ৬।

০৩৫। সৈয়দ আলী আহসান, *জিয়াউর রহমান স্মারক গ্রন্থ*, 'জিয়াউর রহমান : আমার সাক্ষ্য', সম্পাদক রুহুল আমিন, হীরা বুক মার্ট, ১৯৯১, পৃ: ৮৮।

০৩৬। সৈয়দ আলী আহসান, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, সময় প্রকাশন, ২০০৫, পৃ: ৬৫।

০৩৭। পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৬।

০৩৮। পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৬।

০৩৯। পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৭।

০৪০। পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৮।

০৪১। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সৈয়দ আলী আহসান, *স্মরনীয় ব্যক্তিত্ব* বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আশি বছর পূর্তি উদযাপন কমিটি, সম্পাদনা রফিকুল ইসলাম সাঈদ-উর রহমান বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০৪, পৃ: ২৭৭।

০৪২। সৈয়দ আলী আহসান, *জিয়াউর রহমান স্মারক গ্রন্থ*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৭।

০৪৩। সৈয়দ আলী আহসান, *আমার সাক্ষ্য*, 'আমাদের সংস্কৃতি', ঝিঙ্গে ফুল, ২০০৩, পৃ: ৭৭,

Dhaka University Institutional Repository

৭৮।

০৪৪। Dr. Anwar Dil, *কবীর চৌধুরী শিল্পসাহিত্যে ক্লান্তিহীন পরিব্রাজক*, সম্পাদনা মোহাম্মদ আবদুল হাই, 'National professor Kabir Chowdhury: Translator as Transformational Leader', বিদ্যাসাগর সোসাইটি, ২০০৬, পৃ.২০৩।

০৪৫। পূর্বোক্ত পৃ.২২২

০৪৬। সাঈদ-উর রহমান, *শতাব্দির সন্ধিক্ষণ*, গ্রন্থকানন,২০০১,পৃ.১৪৯,১৫০।

০৪৭। আনিসুজ্জামান, 'তিনি সবুজ এবং সবুঝও, *শিল্পসাহিত্যে ক্লান্তিহীন পরিব্রাজক* ,পূর্বোক্ত, পৃ.৭৮

০৪৮। কবীর চৌধুরী, *বাঙালীর আত্মপরিচয়*,সম্পাদনা মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট', বর্ণায়ন, ২০০১;পৃ.২৩৪

০৪৯। Interview by Abul Hashem, The Guardian, July, 1998, *কবীর চৌধুরী শিল্পসাহিত্যে ক্লান্তিহীন পরিব্রাজক*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯১

০৫০। কবীর চৌধুরী, *বাঙালীর আত্মপরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৫।

০৫১। পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৬।

০৫২। পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৬।

০৫৩। পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৮।

০৫৪। পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৫।

০৫৫। পূর্বোক্ত, পৃ.২৪১,২৪২।

০৫৬। সাক্ষাৎকার গ্রহণঃ রতনতনু ঘোষ, *দৈনিক আজকের কাগজ*, ২৭ অক্টোবর ২০০০।

০৫৭। মোহাম্মদ আবদুল হাই, ভূমিকা অংশ, *কবীর চৌধুরী শিল্প সাহিত্যে ক্লান্তিহীন পরিব্রাজক*, পূর্বোক্ত,পৃ.১৫।

০৫৮। মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, *বাঙালির আত্ম পরিচয়*, সম্পাদনা মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম,'বাংলাদেশ-প্রসঙ্গ উত্তরাধিকার', বর্ণায়ন, ২০০১,পৃ.৪১

০৫৯। পূর্বোক্ত,

০৬০। পূর্বোক্ত,

০৬১। পূর্বোক্ত, পৃ.৪২

০৬২। পূর্বোক্ত, পৃ.৪৬

০৬৩। পূর্বোক্ত, পৃ.৪২

০৬৪। পূর্বোক্ত, পৃ.৪৯

Dhaka University Institutional Repository

০৬৫। পূর্বোক্ত,

০৬৬। পূর্বোক্ত, পৃ.৫১

০৬৭। পূর্বোক্ত, পৃ.৫০

০৬৮। পূর্বোক্ত, পৃ.৫১

০৬৯। পূর্বোক্ত,

০৭০। পূর্বোক্ত, পৃ.৫৩

০৭১। পূর্বোক্ত, পৃ.৫৪

০৭২। পূর্বোক্ত,

০৭৩। আহমদ কবির, *আনিসুজ্জামান সংবর্ধনা-স্মারক*,আনিসুজ্জামানের কৃতি ও কীর্তি, মাওলা ব্রাদার্স,২০০৫,পৃ.১০০,১০১।

০৭৪। মনসুর মুসা, 'শিক্ষক ও গবেষক', পূর্বোক্ত, পৃ.৯৭।

০৭৫। আনিসুজ্জামান, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পূর্বোক্ত, পৃ.২১।

০৭৬। আনিসুজ্জামান, 'আমাদের সংস্কৃতি', *বাঙালির আত্মপরিচয়* , মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৪

০৭৭। পূর্বোক্ত, পৃ.৭৫

০৭৮। পূর্বোক্ত,

০৭৯। পূর্বোক্ত, পৃ.৭৬

০৮০। আনিসুজ্জামান, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, 'সাংস্কৃতিক বহুত্ব', পূর্বোক্ত, পৃ.২৯।

০৮১। গোলাম মুস্তাফা, *আনিসুজ্জামান সংবর্ধনা স্মারক*, 'আনিসুজ্জামান মানস', পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৩।

০৮২। Anisuzzaman, Identity, Religion and Recent History, Culcutta, 1995, P-30, উদ্ধৃত গোলাম মুস্তাফা, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫০।

০৮৩। সাঈদ-উর রহমান, *আনিসুজ্জামান সংবর্ধনা-স্মারক*, তাঁর বিশ্বাসের জগৎ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩০।

০৮৪। গোলাম মুস্তাফা, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৪।

০৮৫। আনিসুজ্জামান, *বাঙালী সংস্কৃতি: বৈশিষ্ট্য, বিকাশ, সমস্যা ও সম্ভাবনা*, বেণীমাধব ও ফণীভূষণ স্মারক বক্তৃতা, চট্টগ্রাম, ২০০৩, পৃ.১৬, উদ্ধৃত গোলাম মুস্তাফা, পূর্বোক্ত,পৃ.১৫৪।

০৮৬। আনিসুজ্জামান, 'আমাদের সংস্কৃতি', *বাঙালীর আত্মপরিচয়*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৬।

০৮৭। আনিসুজ্জামান, নির্বাচিত প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬২

Dhaka University Institutional Repository

০৮৮। পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬

০৮৯। যতীন সরকার, *আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ*,'স্মৃতি, কৃতি, নীতি',স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ সংকলিত, মুস্তাফা মজিদ ও আফজালুল বাসার সম্পাদিত, U.P.L, ২০০১, পৃ.৪১৮।

০৯০। মহসিন শস্ত্রপাণি, *আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি*,স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ সঙ্কলিত, সম্পাদক আফজালুল বাসার, অনন্যা ২০০১, পৃ.১৮৪।

০৯১। আহমদ শরীফ, *সংস্কৃতি ভাবনা*, সংস্কৃতি, উত্তরণ, ২০০৪, পৃ.২২।

০৯২। আহমদ শরীফ, *স্বদেশ অন্বেষা*, বাঙালীর সংস্কৃতি, আহমদ শরীফ রচনাবলী-১, আহমদ কবীর ও আবুল হাসনাত সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ২০০০,পৃ.৩৬৪,৩৬৫।

০৯৩। আহমদ শরীফ, *স্বদেশ অন্বেষা*, 'বাঙালির সংস্কৃতি', পূর্বোক্ত।

০৯৪। পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬৭।

০৯৫। প্রথমা রায় মন্ডল, 'আহমদ শরীফের দৃষ্টিতে বাঙলা, বাঙালি ও বাঙালিত্ব', *দ্রোহের স্মারক*, ৮০তম জন্ম উৎসব মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত, স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ, ২০০০,পৃ.৩৫

০৯৬। আহমদ শরীফ, '*ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি*', *বাংলাদেশের সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি*, স্বদেশচিন্তাগ্রন্থমালা, স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ, পৃ.৯।

০৯৭। বদরুদ্দীন উমর, *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা*, মুখবন্ধ, প্রাচ্য বিদ্যা প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ.১৩।

০৯৮। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *আশা আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩; পৃ.৩০৭।

০৯৯। বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৬,৪৭

১০০। আবুল কাসেম ফজলুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০৯।

১০১। বদরুদ্দীন উমর, *সংস্কৃতির সংকট*, শ্রাবণ, ২০০৩, পৃ.৪১।

১০২। বদরুদ্দীন উমর, 'বাংলাদেশের বাঙালি সংস্কৃতি', *বাঙালীর সংস্কৃতি চিন্তা*, সঙ্কলন ও সম্পাদনায় আবুল কাসেম ফজলুল হক ও মিজান রহমান, কথা প্রকাশ ২০০৯ পৃ.২৪০

১০৩। পূর্বোক্ত, পৃ.১৫২

১০৪। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *রাষ্ট্রের মালিকানা*, বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ. ৩১

১০৫। পূর্বোক্ত,

১০৬। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি*, আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৩, পৃ.৩৬

১০৭। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *পুঁজিবাদের দুঃশাসন*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১, পৃ.১৯

১০৮। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *গণতন্ত্রের পক্ষ-বিপক্ষ*, বিদ্যাপ্রকাশ,১৯৯১, পৃ. ১২

১০৯। প্রথমা রায় মন্ডল, *বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব*, প্রতীক বুকস,

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতা,১৯৬৬,পৃ.৩৪৭।

১১০। সিরজুল ইসলাম চৌধুরী, *গণতন্ত্রের পক্ষ-বিপক্ষ*, পূর্বোক্ত, পৃ.১০১

১১১। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *পুঁজিবাদের দুঃশাসন*, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৩

১১২। সৈয়দ আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব বাংলা বিভাগ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৯৪।

১১৩। রফিক আজাদ, সাক্ষাৎকার, *সাহিত্যে মনন-সৃজন ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*, (মোস্তফা মোহাম্মদ), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৯,পৃ.৫১।

১১৪। সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৯৮

১১৫। লিরিক সংখ্যা ৮,১৩৯৯, পৃ.১৪৯-৫০, উদ্ধৃত সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৯৫।

১১৬। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮,পৃ.১৪৬

১১৭। পূর্বোক্ত, পৃ.১৮০

১১৮। পূর্বোক্ত, পৃ.১৮১

১১৯। সলিমুল্লাহ খান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সংস্কৃতি চিন্তা, সাহিত্য সাময়িকী, *দৈনিক ইত্তেফাক*,২৮ মার্চ, শুক্রবার, ২০০৮,পৃ.২১

১২০। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৬,২৭।

১২১। পূর্বোক্ত, পৃ.২৭

১২২। পূর্বোক্ত, পৃ.২৮

১২৩। পূর্বোক্ত, পৃ.৩০

১২৪। পূর্বোক্ত, পৃ.৩২

১২৫। পূর্বোক্ত, পৃ.১৮৭

১২৬। সলিমুল্লাহ খান, পূর্বোক্ত,

১২৭। পূর্বোক্ত,

১২৮। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা অংশ, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭

১২৯। আহমদ ছফা , *বাঙালি মুসলমানের মন*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৯, পৃ.৩২।

১৩০। পূর্বোক্ত, পৃ.৭২।

১৩১। পূর্বোক্ত, পৃ.৭১।

১৩২। পূর্বোক্ত, পৃ.১৭।

১৩৩। পূর্বোক্ত, পৃ.১১০।

১৩৪। পূর্বোক্ত, পৃ.৭৮।

১৩৫। পূর্বোক্ত, পৃ.১৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৬। পূর্বোক্ত, পৃ.৭২।

১৩৭। বদরুদ্দীন উমর, 'ভূমিকা অংশ', বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস, *রচনাবলী(২)*, আহমদ ছফা, সন্দেশ,২০০১,পৃ.২১৭

১৩৮। আহমদ ছফা, *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ.২২১

১৩৯। আহমদ ছফা, *বাঙালী মুসলমানের মন*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৬

১৪০। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *রাজনীতি ও সংস্কৃতি:সম্ভাবনার নবদিগন্ত*, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০২,পৃ.৮১

১৪১। পূর্বোক্ত,

১৪২। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *সংস্কৃতির সহজ কথা*, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০২, পৃ. ২৯, ৩০।

১৪৩। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *রাষ্ট্রচিন্তায় বাংলাদেশ*, কথাপ্রকাশ,২০০৮,পৃ.১৪৪

১৪৪। পূর্বোক্ত, পৃ.৮২

১৪৫। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *কালের যাত্রার ধ্বনি*, জাগৃতি প্রকাশনী, ২০০২, পৃ.১৫।

১৪৬। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *রাজনীতি ও সংস্কৃতি:সম্ভাবনার নবদিগন্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৭

১৪৭। পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী

১. বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মানস-প্রবণতা ও সামাজিক ভূমিকা

"বুদ্ধিজীবী হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি জনগণের প্রতি ও জনগণের জন্য সোচ্চার এবং মতামত দর্শন উপস্থাপন ও গ্রন্থিবদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর।"[১] পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে বুদ্ধিজীবীর উত্থানের সাথে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক আছে। আধুনিক ইতিহাসে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলেই বিবেচিত হয়। তাই মিশেল ফুকো বলেছেন, "বুদ্ধিজীবী ছাড়া আধুনিক ইতিহাসে কোন বিপ্লব সংঘটিত হয়নি, তেমনি বুদ্ধিজীবী ছাড়া পৃথিবীতে প্রধান প্রতিবিপ্লবও সংঘটিত হয়নি।"[২]

সুতরাং বুদ্ধিজীবীর সামাজিক ভূমিকা আবশ্যক। এই ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়েই তাঁর দায়বদ্ধতার প্রকাশ ঘটে থাকে। বুদ্ধিজীবী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিবেকের তাড়নায়, যে কোন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করবেন, ক্ষমতাময় হিংস্রতার মুখেও সত্য প্রকাশে নির্ভীক হবেন। বুদ্ধির সাথে বিবেকের সমন্বয় ঘটিয়ে রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতির সমূহ ক্ষতিকর দিকগুলোকে চিহ্নিত করে সতর্ক করবেন, সম্ভাবনার দিকগুলো নির্দেশ করবেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে জাতির সমাজের পথনির্দেশনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের দ্বার উন্মোচন করবেন। সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় বুদ্ধিজীবীদের এই দায়িত্বের কোন পরিবর্তন হয় না তবে কাজের পথ ও পদ্ধতির পরিবর্তন হয়।

গত ত্রিশ বছরে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্র পরিবর্তনের ধারা, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক ক্ষমতা কেন্দ্র পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-চেতনা, কার্যক্রম ও আচরণে প্রকাশ পেয়েছে নানাবিধ পরিবর্তন। সত্তর দশকের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধ ছিল অল্প বিস্তর প্রখর। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, উদারনৈতিক, মানবতাভিত্তিক একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তর করার প্রচেষ্টা প্রায় লেখকের

Dhaka University Institutional Repository

রচনায় কমবেশী পাওয়া যায়। যদিও তাঁদের মধ্যে মত এবং পথের ভিন্নতা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ পার্থক্যের মৌলিক দিক হল পুঁজিবাদ বনাম সমাজবাদ। পরবর্তীতে রাজনৈতিক পালাবদলের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীতে বুদ্ধিভিত্তিক চর্চা ও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রশ্নে মতভিন্নতা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। "আশির দশকে এসে এই বিভাজন সুস্পষ্ট তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়।

১. আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের ধারা

২. বিএনপি-জামায়াতি বুদ্ধিজীবীদের ধারা, এবং

৩. এনজিওপতি ও সুশীল-সমাজীদের ধারা।"[৩]

এই বিভাজিত বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদের মানস প্রবণতার বৈশিষ্ট্য জটিল থেকে জটিলতর। কোন সরলীকরণ পদ্ধতিতে তা সুনির্দিষ্ট করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তবুও তাঁদের মধ্যে কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান অধ্যায়ে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে তাঁদের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, চিনের বিপ্লবের ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, বুদ্ধিজীবীদের ধ্যান-ধারণা বিকশিত হবার ক্ষেত্র হল সমাজ জীবন। জনগণের জীবনপ্রবাহ একটি দেশের ও সমাজের প্রাণকেন্দ্র। এই প্রাণকেন্দ্র থেকে প্রাণরস গ্রহণ করতে না পারলে জীবন হয়ে পড়ে অভিজ্ঞতাশূণ্য। অভিজ্ঞতাশূণ্যতার মূল নিহিত জনবিচ্ছিন্নতায়। জনবিচ্ছিন্নতার জন্য বুদ্ধিজীবীরা জনগণের মানস-প্রবণতা অনুধাবন করতে অক্ষম। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা শুধু বই-পুস্তক, সিনেমা নাটক, বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারিত জীবনকে দেখে পরোক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চালিত হন। আহমদ ছফা তাঁদেরকে 'বুকিশ' বলে অভিহিত করেছেন। সেজন্যই তাঁদের ভাবনায়-চিন্তায় 'দেশ' নাম শিরোনাম হয়ে থাকে কিন্তু ভেতরে সম্পূর্ণভাবে 'দেশ' থাকে অনুপস্থিত। জনবিচ্ছিন্নতার দরুণ "সেন্স অব বিলংগিং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তৈরী হয়না।"[৪]

বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত যুগোপযোগী। বর্তমানকে ভবিষ্যতের সুনির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে হলে পশ্চাতমূখী হলে তাঁকে চলে না। প্রেক্ষিত ও প্রয়োজন বদলায় আর তার সাথে

Dhaka University Institutional Repository

সাথে বুদ্ধিজীবীদেরও অনড় ধারণা, বদ্ধবিশ্বাস ও তত্ত্বের আবরণ থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। "বুদ্ধিজীবীর একটা নিটল ভূমিকা আছে, একথা মনে করার হেতু নেই, বরং তাৎক্ষণিক ভূমিকাটি তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের সাথে মানিয়ে নিয়ে গড়ে তোলা দরকার।"[৫] যে কোন দ্বন্দ্বের সমাধানের প্রশ্নে তাঁকে যুক্তি, চিন্তা ও তত্ত্বের আশ্রয় নিতে হবে। দর্শন চর্চা তাঁর বড় সহায়ক। বর্তমানে সমাজের নানা দ্বন্দ্ব-সমস্যার মধ্য থেকেও তিনি হবেন ভবিষ্যতে নতুন সমাজ বিনির্মানে আগ্রহী। কিন্তু "যে বুদ্ধিজীবী নিজের সময় ও সমাজ নিয়ে সন্তুষ্ট সে গৃহপালিত "[৬] বুদ্ধিজীবী।

বাংলাদেশের মানুষকে অপরিণামদর্শী চিন্তা-ভাবনা দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত করে বিভ্রান্ত করেন একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। 'বিতর্কের বিষয়' নয় এমন বিষয়গুলোকে 'বিতর্কের বিষয়' বানিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। তাঁরা বিবেকী দায়িত্ব অবহেলা করে রাজনৈতিক দলের ও সংগঠনের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। 'মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের' শক্তি ও 'মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের' শক্তি, 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গঠন, 'মৌলবাদবিরোধী' 'নাস্তিকতা' প্রচার 'নারীবাদী' আন্দোলন ইত্যাদির প্রচার, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থ-ই রক্ষিত হয়। জাতীয় স্বার্থে এগুলো প্রচারের নামে হীন উদ্দেশ্যও ক্রিয়াশীল থাকে। এ প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য:

'নয়া উপনিবেশবাদী এবং মুৎসুদ্দি, মহল থেকে যখন 'মানবাধিকার' 'উন্নয়ন' 'গণতন্ত্র' 'ধর্ম' 'নৈতিকতা', 'মৌলবাদবিরোধিতা', 'নারীবাদ', 'পরিবেশ সচেতনতা' ইত্যাদি গরিব দেশগুলোতে প্রচার করা হয়, তখন তাদের প্রচারিত বক্তব্যকে নির্বিচারে গ্রহণ করা গরিব দেশের জনগণের জন্য আত্মঘাতী ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়।...মানুষের মর্যাদা ও অধিকার, মানবতাবাদ, গণতন্ত্র, নারীমুক্তি, স্বনির্ভরতা বা আত্মনির্ভরতা, নৈতিক আদর্শ, মুল্যবোধ–এসব অত্যন্ত মহান বিষয়। পৃথিবীর সর্বত্র সর্বাবস্থায় প্রত্যেক জাতির জীবনেই এসবের অপরিহার্যতা আছে।...কেবল জয়লাভের বাহাদুরি অর্জনের জন্য বিচার-বিবেচনাহীন, উত্তেজনাপূর্ণ, তিরস্কারমূলক, চমক সৃষ্টিকারী তর্ক বিতর্ক ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মোটেই কল্যাণকর হচ্ছেনা।"[৭]

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা পরমতে অসহিষ্ণু। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সামান্য মত-পার্থক্য নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ির দ্বারা সৃজনশীল বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার পরিবেশ ও সম্ভাবনা নষ্ট করে থাকেন। তাঁদের বুদ্ধিবাদিতার গুরুত্বপূর্ণ সময় তাঁরা এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ব্যয় করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে তাঁরা ভেতরে সত্যসন্ধানী মনটিই নষ্ট করে ফেলেন এবং সমাজে দেখা দেয় বুদ্ধিবৃত্তিক শূণ্যতা (Intellectual Vacuum)। আহমদ ছফা মনে করেন, আসলে তাঁরা "সৃজনশীলতার ক্ষেত্র অতিক্রম করে দুধরণের লাঠি বগলে নিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছেন। কেউ 'রাজনীতির লাঠি' কেউ 'ধর্মের লাঠি'।"[৮]

বুদ্ধিজীবীরা দ্বিচারী নীতি অবলম্বন করেন। কারণ, তাঁরা উভয় কূল রক্ষা করে চলেন। সেজন্যই তাঁরা কাজের বিপরীতে কথা বলেন আর কথার বিপরীতে কাজ করেন। কথা ও কাজের সমন্বয় ঘটে না। (বুদ্ধিজীবীরা নিজেকে সামাজিক উৎসবময় পরিবেশে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং নিজের সত্যিকার অবয়বটাকে সযত্নে ঢেকে রাখেন।) যেমন, "সভাসমিতি করে, কমিশন বসিয়ে স্থির করা হলো যে, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী শেখানো উচিত নয়, পরে দেখা গেল, সেসব হলো আমজনতার জন্য বুদ্ধিজীবীদের উপদেশ। সব বুদ্ধিজীবীরাই নিজ নিজ সন্তানদের নামীদামি ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে পড়ান।"[৯] এ ব্যাপারে আরেকটি বিষয়েরও গভীর প্রভাব পড়ে বুদ্ধিজীবীদের মানস প্রবণতায়। সৎ সাহসী বুদ্ধিজীবীরাও অনেকসময় 'জীবিকাচ্যুতির' আশঙ্কায় তটস্থ থাকেন সেজন্য উভয়কুল রক্ষা করে চলেন। জীবনের আশ্রয় যে জীবিকা তা সভ্য সমাজের অন্য একজন মানুষের মত বুদ্ধিজীবীকেও সমানভাবে আকর্ষণ করে। অবশ্য "সভ্য জগতে খাদ্য জীবিকা নয়- এর প্রতীক অর্থ- সম্পদই জীবিকা।"[১০] এই জীবিকার দাসত্ব করতে গিয়েই তাঁরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে 'সত্যের অনাবৃত' প্রকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হন। "তাই তাঁদের সকল বক্তব্যে প্রকৃত চিন্তাচর্চার পরিচয় পাওয়া যায় না। বড়জোর বাকচর্চার উদাহরণ হিসেবেই তাদের এই সব বক্তব্যকে গ্রহণ করা যায়।"[১১]

দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন, প্রতিবাদ প্রতিরোধ দেখলে নিবেদিত প্রাণ, নিঃস্বার্থ বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁরা নিজেদের নিরাপদে রেখেই আন্দোলন করে। জনগণকে তাঁরা পথেও নামায়, নিজেও নামে। যেমন "তারা আন্দোলন করে পরিবেশ বিনষ্ট করার বিরুদ্ধে, জমিতে রাসায়নিক সারের বিরূদ্ধে যৌতুকের বিরুদ্ধে, গ্লোবালাইজেশনের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, অতিরিক্ত মুনাফার বিরুদ্ধে, ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে, বহুতল দালানের বিরুদ্ধে, গাছ কাটার বিরুদ্ধে, এসিড ছোড়ার বিরুদ্ধে, পানিতে আর্সেনিকের বিরুদ্ধে,

Dhaka University Institutional Repository

মানবিক অধিকারের পক্ষে, কিসে নয়?"[১২] এতে করে তাঁরা জনগণের কাছে সেলিব্রেটি বনে যান। 'লোক দেখানো আন্দোলন' করে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য জনগণকে দোষারোপও করে কিন্তু ক্ষতস্থানটি সযত্নে ঢেকে রাখে। বাজার অর্থনীতির প্রভাবে সমস্যাগুলো যারা তৈরি করছে "তারাই রাষ্ট্র ও দেশের কর্ণধার, বুদ্ধিজীবীরা তাদেরই সমর্থকের খাতায় নাম লিখিয়ে বসে আছেন বহুদিন ধরে।"[১৩] এই সব বুদ্ধিজীবীরা স্বরিবোধী ও পরস্পর বিরোধী হলেও একই বিষয়ে তাঁরা বহুবার মত পাল্টান।

"তথ্য প্রযুক্তি বিশ্বকে ছোট করে দিয়েছে; আকারে নয় সময়ের দিক থেকে বিশ্বকে নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়"[১৪] উপনিবেশ কালের রাজনৈতিক প্রভূত্ব, বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে অনুন্নত দেশগুলোতে টিকিয়ে রাখার জন্য উপনিবেশবাদীরাও পর্দার আড়ালে থাকেন তৎপর। "বহু জাতিক সংস্থাগুলো যেভাবে তাদের দাবা বোর্ডের গুটি সাজিয়েছে তাতে পারিবারিক অভিজ্ঞান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শুরুতেই ছিল। বিশ্বায়ন চায়, পরিবার থেকে শুরু করে প্রত্যেক ক্ষেত্রে শিকড়হীন ব্যক্তিত্ব।"[১৫]

রাষ্ট্র সরকারের চেয়েও বহুজাতিক কোম্পানী গুলো আজ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। জাতীয় পর্যায়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশ আজ আর কোন ভৌগোলিক সীমারেখায় চিহ্নিত করা যায় না। মিডিয়াগুলো বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর ইচ্ছে পূরণের বড় হাতিয়ার। আমাদের রাজনীতি সংস্কৃতি প্রশ্নে বুদ্ধিজীবীরা পালন করেন কম্প্রেডরের ভূমিকা। স্বদেশে বসে এই সব বুদ্ধিজীবীরা বিদেশের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত। Comprador কথাটির ব্যবহার এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যার প্রয়োজন দাবী করে:

"স্বদেশ ও স্বজাতি কল্যাণ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যে লোকেরা আত্মস্বার্থ হাসিলের জন্য বৈদেশিক শক্তির কিংবা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহযোগী হিসেবে কাজ করে কিংবা যারা আত্মস্বার্থ হাসিলের জন্য স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বৈদেশিক শক্তির কিংবা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাজ করে। তাদের আধুনিক রাজনৈতিক পরিভাষায় ইংরেজিতে বলা হয় 'কম্প্রেডর'। 'কম্প্রেডর' রাজনৈতিক শব্দটি পূর্বে বিদেশীদের সঙ্গে সংযোগকারী বা যোগাযোগকারী অর্থে ব্যবহৃত হলেও এখন শব্দটির অর্থ পরিবর্তন হয়েছে। বাংলা ভাষায় কম্প্রেডর শব্দটির প্রচলিত প্রতিশব্দ মুৎসুদ্দি।"[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর আয়তনের সম্প্রসারণ হচ্ছে বাজার সম্প্রসারনের থিওরি অনুসারে। কর্পোরেট সংস্থাগুলোর কাছে ব্যবসাই বড় কথা। গণমাধ্যম থেকে শুরু করে এনজিও গুলোতেও তাঁদের ব্যাপক প্রভাব। দরিদ্র দেশের বুদ্ধিজীবীরাও দারিদ্য দূরীকরণে ও সংস্কৃতিসেবী হিসেবে মিডিয়াঘনিষ্ঠ ও এনজিওঘনিষ্ঠ। কর্পোরেট সংস্থাগুলোর স্বার্থে তাঁরা 'দারিদ্র্য বণিজ্যে' অংশ নেয়। গরীব জনগণের কাছে তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা তুলে দেওয়ায় ও সস্তা বিনোদনে ব্যস্ত রাখায় জাতির মধ্যে উন্নতর ভালো চেতনার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। চেতনার এ নিম্নগামিতা লক্ষ্য করে আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর 'রাজনীতি ও সংস্কৃতি: সম্ভাবনার নবদিগন্ত' গ্রন্থে বলেন:

"এনজিওদের কাজের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে সত্য, কিন্তু যেভাবে তারা কাজ করছে তার রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিণতি জাতির জন্য অত্যন্ত খারাপ হতে বাধ্য। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্র পরাধীন হয়ে যাচ্ছে, জাতির সাংস্কৃতিক চেতনা বিকারপ্রাপ্ত হচ্ছে। আধিপত্যলিপ্সা ও মালিকানালিপ্সার যে কেন্দ্রিয় তাড়না বা মূল চালিকা শক্তি (Central Motive) দ্বারা আজ ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে, তারও পরিণতি মর্মান্তিক হতে বাধ্য। ...বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সুযোগ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীরা আধিপত্যবাদী এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার যে নীতি (globalization) গরিব দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দিচ্ছে, তার মধ্যে হারিয়ে গেলে আমরা সমূহ ক্ষতির মধ্যে পড়বো।"[১৭]

যে কোন নিরপেক্ষ বিচারে স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক ভূমিকা অনেকটাই হতাশাব্যঞ্জক। উপনিবেশিক শাসনামলের গড়ে ওঠা নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধারাবাহিক বিকাশ, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মানস-প্রবনতায়ও ফেলেছে গভীর প্রভাব। সে বৃত্ত থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসতে পারেনি। বৃটিশ আমলের পাশ্চাত্য শিক্ষায় গড়ে উঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল পরনির্ভরশীল ও সুবিধাভোগী। বাঙালী মুসলমানরা অনেক পরে শিক্ষা-দীক্ষায় ও চাকুরীতে প্রবেশ করলেও এই বৃত্তের বাইরে নয়। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে বেরিয়ে আসা বুদ্ধিজীবীরাও পরনির্ভরশীল ও সুবিদাভোগী হবে এটি স্বাভাবিক। তদুপরি স্বাধীন বাংলীদেশে এই নব্য বিকশিত শ্রেণীটি যখন একটি রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয় এবং নেতৃত্বের স্থানে আসে তখন স্বাধীনতার সুযোগ তাদেরকে অনেকটা স্বেচ্ছাচারী হতে সাহায্য করেছে। স্বাধীনতার পরপরই আহমদ ছফা 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' গ্রন্থে 'লেখকের কথা' অংশে এ যুগ সম্পর্কে যে ধারনা দিয়েছেন তা থেকে এ কথার সত্যতা অনুধাবন করা যায়। আহমদ ছফা বলেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

"আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যখন রক্ত দিয়েই চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছি। চারদিকে এতো অন্যায়, অবিচার এতো মূঢ়তা এবং কাপুরুষতা ওঁৎ পেতে আছে যে এ ধরনের পরিবেশে নিতান্ত সহজে বোঝা যায় এমন সহজ কথাও চেঁচিয়ে না বললে কেউ কানে তোলেনা।...সুযোগ সন্ধানীরা অল্প বিস্তর চিরকাল থাকে। ...তার বাইরেও দেশের মানুষের হয়ে অকৃত্রিমভাবে কিছু অনুভব করতে চেষ্টা করছি।"[১৮]

স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা তাই ক্ষমতার মোহের কাছে সহজেই আত্মসমর্পণ করেছে। রাজনৈতিক সমাজের ভুল-ত্রম্নটি ধরিয়ে না দিয়ে, তাদের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকার প্রবণতার মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রথমেই পথ হারাতে থাকেন। কয়েক দশকের মধ্যে তাঁরা রাজনৈতিক দলের প্রচারনায় প্রচারকের ভূমিকায় নামে। 'বাঙালি সাংস্কৃতি', 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নিয়ে তাঁরা সার্বজনীন কোন ধারনা দিতে চেষ্টা করেননি বরং এগুলো নিয়ে তাঁদেরকে রাজনীতি করতেই দেখা গেছে। বুদ্ধিজীবীদের বেশিরভাগই ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলভূক্ত হয়েছেন। এবং দলীয় পরিচয়ে ও দলের সমর্থনে বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সাহিত্যের সুবিধামত ব্যবহার করেছেন।

"প্রচার মাধ্যম, প্রযুক্তি, এনজিও ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে প্রচুর অর্থ লাভে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। আলোচক, বিশ্লেষক, পরামর্শক হিসেবে তাঁরা এখন কর্পোরেট বাণিজ্য বিস্তারে সাহায্য করেছেন। রাজনৈতিক আরেকদল বুদ্ধিজীবী আছেন যারা দল মত নিরপেক্ষ। তারা কোন রাজনৈতিক শক্তির সহযোগী হিসেবে কোন অংশেই সক্রিয়তা দেখাননা। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেননা "এরা কথা বলেন শিল্প-সাহিত্যের মতো তথাকথিত 'রাজনীতি নিরপেক্ষ' 'নিরাপদ' বিষয় নিয়ে অথবা ভিনদেশী রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বিষয়ে।"[১৯]

বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় সংকট (Identity Crisis) একটি সমস্যা সৃষ্টি করে সমাজ জীবনে। নিজেকে কোন সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে পরিচিত করতে সিদ্ধান্ত হীনতায় ভোগে। আর এই সিদ্ধান্ত হীনতাজনিত কারণে তাঁরা পরদেশের স্বীকৃতির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন এবং হীনমন্যতায় ভোগেন। আসলে সেটি হয়ে পড়ে "অন্য একটা কালচারে নিজেকে গ্রাফট করার চেষ্টা।"[২০]

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের কোলকাতামুখিতা তাঁদের স্বাধীন চিন্তা ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। স্বাধীন চিন্তা ভাবনা স্বাধীন দেশের বুদ্ধিজীবীদের জন্য কাঙ্খিত না হয়ে তাঁরা অবিভক্ত বাংলার কলকাতার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করেন ফলে, অনাকাঙ্খিত পশ্চাৎ মুখিতার দায়ভার জাতিকেই বহন করতে হয়। তাই বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' কাম্য।

বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীদের মানস-প্রবনতার এই বৈশিষ্টগুলোরই শুধু প্রকাশ ঘটেনি, এর বিপরীতে অন্য মানসিকতার প্রকাশ ও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে উচ্চারিত হচ্ছে। যদিও তাদেরকে প্রায় সবসময় সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, কারাবাস, নির্বাসনের মত ঘটনাও তাঁদের অনেকের জীবনে অনিবার্য হয়ে উঠে। কিন্তু এত সব করেও সমাজ বা রাষ্ট্রকে বুদ্ধিজীবী শূণ্য করা যায়না।

কমিউনিজমের পতন ও ওয়াশিংটন কেন্দ্রিক বিশ্বায়ন ব্যবস্থা বাংলাদেশের কিছু বুদ্ধিজীবীদের পথহারা করলেও এই প্রতিকূল পরিবেশ সত্যসন্ধানী বুদ্ধিজীবীদের বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং এই পরিবেশ পরিস্থিতির পারস্পারিক ও দ্বান্দ্বিক অবস্থান তাঁদের সত্য উদঘাটনের পক্ষে কখনো কখনো সহায়ক হয়েছে। প্রগতিশীল এই বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা হাতে গণা কয়েকজন। নিঃসঙ্গতার বেদনায় যন্ত্রনাবিদ্ধ হতে হয়েছে তাঁদেরকে । কিন্তু জাতীয় জীবনের গুরত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে মতপ্রকাশে ঝুঁকি গ্রহণ করতে তাঁরা কুণ্ঠিত হননি। বৈষয়িক ক্ষতি স্বীকার করে, লোকনিন্দা উপেক্ষা করে, কোন প্ররোচনার শিকার না হয়ে অন্ত রের তাগিদে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে বিচার প্রবণ মানসিকতা নিয়ে এসব জাগ্রত বিবেক বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের প্রতিকুল পরিবেশে একাকী ও নিঃসঙ্গ। তাঁদের মতামত ও বিবেচনা জাতীয় জীবনে উপযুক্ত মর্যাদা পায় না। "তাদের কোন কেন্দ্র ও ধারা নেই। সৃষ্টিশীল এই বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা অন্য সব ধারার বুদ্ধিজীবীদের জন্যই সুযোগ ও সৃষ্টির সম্ভাবনা হারাচ্ছে। এঁরা সকলে মিলে এমন এক ক্ষমতা কাঠামো (Power Structure) ও মানসভিত্তি (Mindset) তৈরী করে রেখেছেন যে, এখানে সৃষ্টিশীল চিন্তার প্রকাশ অসম্ভব প্রায়।"[২১]

Dhaka University Institutional Repository

২. রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

সভ্য সমাজে মানুষের সামাজিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হল সভা-সমিতি ও সংগঠন। এদেরে মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য প্রকাশের জন্য এবং তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে জনমত গঠনে বিশেষভাবে সহায়ক। সংগঠনের মধ্যে যেমন তাত্ত্বিক সংগঠক থাকেন তেমনি কর্মী সংগঠকও থাকে, আবার কখনও কখনও অভীষ্ঠ লক্ষ্য পূরণে তারা দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সমকালীন জীবনের কোন ঘটনা বা সমস্যা সম্পর্কে বা সংকট উত্তরণের প্রশ্নে তাঁরা সবসময় ঐক্যমতে পৌছতে পারেন না। কিন্তু কখনও কখনও ভিন্নমতের বা সমমতের বুদ্ধিজীবীরাও একতাবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। বুদ্ধিজীবী সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। তাই একজন সৃজনশীল বুদ্ধিজীবী যেমন তাঁর লিখিত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জনমনকে প্রভাবিত করে থাকেন তেমনি "যে সব রাজনীকিত ও সমাজ কর্মী জনসেবার নাম করে বিনা পুঁজিতে ধন-মান যশ অর্জনে প্রয়াসি, তাদেরকে যথার্থ গণসেবী হওয়ার জন্য নৈতিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে থাকেন"[২২] আবার জাতীয় রাজনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বুদ্ধিজীবী ঐক্যমতের ভিত্তিতে অথবা কখনও স্বতন্ত্রভাবে জনমুখী দায়িত্ব পালনে, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে, দায়বদ্ধ। তবে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠনকেন্দ্রিক বা জোটকেন্দ্রিক হয়।

আর্থ-সামাজিক বৈষম্য চেতনার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় যে, রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবার শক্তি অর্জন করেছিল। সে সময় (১৯৪৭-১৯৭১) যে সব সাংস্কৃতিক সংগঠন যেমন তমুদ্দন মজলিস (১৯৪৭) সংস্কৃতি সংসদ (১৯৫১) পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৫২) পাকিস্তান লেখক সংসদ পূর্বাঞ্চল শাখা (১৯৬২) পাকিস্তান লেখক সংসদ (১৯৫৯) বুলবুল ললিত কলা একাডেমী (১৯৫৫) ছায়ানট (১৯৬১) নজরুল একাডেমী (১৯৬৪) এগুলোর মধ্য দিয়ে চিন্তার যে প্রবাহ লক্ষ্য করা যায় তাতে কিছুটা রক্ষণশীলতা থাকলেও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিল। বুদ্ধিজীবীরা ভাষা আন্দোলনের যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা তৎকালীন সাংস্কৃতিক রাজনীতিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অর্জন। সাংস্কৃতিক আন্দোলন গুলোতে সরকারী

Dhaka University Institutional Repository

নীতি সমর্থিত বুদ্ধিজীবী ও সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিজীবীদের কার্যক্রম থেকে বোঝা যায় সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিজীবীদের চেতনা সুসংবদ্ধ ছিল না । "প্রতিবাদ যত করেছেন, বিনির্মাণে ততটা মনোযোগী হতে পারেননি"[২৩]। বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা প্রত্যাশিত হয়ে উঠেছিল দুটি কারণে (এক) উন্নত রাজনৈতিক নেতৃত্ব গঠনে (দুই) গণবিরোধী রাজনীতির বিকল্পে জনগণের রাজনীতির পথ অনুসন্ধানে। কিন্তু স্বাধীনতার পর বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গনে সরকারী পৃষ্টপোষকতায় প্রথম জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে "সেখানে প্রতিবাদী ও প্রতিষ্ঠিত সমাজ কাঠামো পরিবর্তনকামী' বুদ্ধিজীবীরা অংশগ্রহণ করতে পারেননি। সরকার সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা আমন্ত্রিত হয়েছিল"[২৪]।

১৯৭৪ সালের ৩১ মার্চ মাসে 'দেশের বিরোধী রাজনীতি এবং নেতৃত্বের শূণ্যতার প্রেক্ষিতে সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ "নাগরিক অধিকার ও আইন সাহায্য কমিটি (The Committee for Civil Liberties and Legal Aid) নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলে তৎকালীন রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল"[২৫]। ২১ জুন এই কমিটি লিফলেট প্রচার করেছিল। মওদুদ আহমদ এই কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং কবি সিকান্দার আবু জাফর ও এনায়েতুল্লাহ খান ছিলেন এর সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ। জাতীয় প্রেসক্লাবে প্রথম বৈঠকে সরকারের সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা কয়েকটি জনগুরুত্বপূর্ণ দাবী উত্থাপন করেছিল। গণসংস্কৃতি পরিষদ (১৯৭২) ও বাংলাদেশ লেখক শিবির (পূর্ব নাম লেখক সংগ্রাম শিবির) এর রাজনৈতিক বক্তব্য ছিল। বুদ্ধিজীবীরা এসময় সুবিধাবাদিতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। সরকার সমর্থিত বুদ্ধিজীবীরা এসময় শক্তিশালী একটি অবস্থান গড়ে তোলেন সমাজ জীবনে। লেখক শিবির ১৯৭৪ সালে স্বাধীন মতামত প্রকাশ বন্ধ করার জন্য সরকারী অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে ও ভারত সিকিম দখল করে নিলে প্রতিবাদ করেছিল। ১৯৭৪ সালে জুন মাসে "একাত্তর-উত্তর বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করেছিল"[২৬]। "লেখক শিবির আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে ১৯৭৮ সালে উন্মেষ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদসহ মোট ১৩টি সংগঠন মিলে 'গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ফ্রন্ট' গঠন করে এবং পরে আরো ১৪টি সহ মোট ২৭টি সংগঠন মিলে 'প্রথম জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে সারা দেশের কয়েক হাজার কর্মী অংশগ্রহণ করে"[২৭]।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়নি এবং বুদ্ধিজীবীরা রাজনীতি বিমুখও হননি। সমাজ-সংস্কৃতির প্রশ্নে ষাট এর দশকের উজ্জীবিত চেতনাকে তাঁরা প্রগতির স্বার্থে বেগবান করবার চেষ্টা করেছেন। এই রাজনীতি সচেতনতা বুদ্ধিজীবীদের কোন কোন ক্ষেত্রে বিতর্কিতও করে ফেলেছে। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় (১৯৮১) 'নাগরিক কমিটি'তে যুক্ত বুদ্ধিজীবীরা আওয়ামীলীগ জোটের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী জেনারেল ওসমানীকে 'নাগরিক কমিটি'র প্রার্থী করে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেন। এতে করে "নাগরিক কমিটির ভূমিকা রাজনীতির স্বাভাবিক গতিধারাকে বদলে ফেলে"[২৮]। আশির দশকে বুদ্ধিজীবীরা রাজনীতিঘনিষ্ট হন বেশী। তাঁরা রাজনৈতিকদল কেন্দ্রিক আন্দোলনে বেশি উৎসাহ বোধ করেছেন। "এরশাদ শাসনামলে ৩১ জন বুদ্ধিজীবীর একটি গ্রুপ গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল বাংলাদেশ গঠনের জন্য জনমত গঠনে বিবৃতি দেন ১৯৮৭ সালের ৩০ মার্চ"[২৯]। "আবার এসময় এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সরকারকে সহযোগিতার জন্যও এগিয়ে এসেছেন।"[৩০] "স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি' নামে একটি কমিটি ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে গঠিত হয় সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি সেবীদের নিয়ে। তারাঁ অষ্টম সংশোধনীর বিল নিয়ে জনমত গঠন করেন এবং জাতি বিভক্তির মধ্য দিয়ে হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার অপকৌশলকে রুখতে তৎপর হয়ে ওঠেন। এ সময়ে প্রথম 'জাতীয় কবিতা' উৎসবে (১৯৮৭) এরশাদ শাসনের শৃঙ্খল ভাঙ্গার প্রত্যয় ঘোষনা করেন। দ্বিতীয় জাতীয় কবিতা উৎসবে (১৯৮৮) শিল্পী কামরুল হাসান এরশাদের কার্টুন এঁকে নিচে লিখে দিয়েছেন "দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে"[৩১] । কিন্তু তার কিছুক্ষন পরেই তিনি মৃত্যুবরন করেন। এভাবেই বুদ্ধিজীবীরা ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত নানা রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নির্ভীক কর্মীতে রূপান্ত রিত হন। যার ফলশ্রুতিতেই রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে।

বুদ্ধিজীবীরা কখনো সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কখনো রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে "গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ"[৩২] করেছেন। "এ সময় রাজনীতিতে এনজিও ও সিভিল সোসাইটি সমূহের বুদ্ধিজীবীদের সীমাহীন সক্রিয়তা দেখা যায়"[৩৩]। "বাংলাদেশের সুশীল সমাজের চরিত্র বিশ্লেষণে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে সিপিডি, নাগরিক

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি, টিআইবি ও অধুনা 'সুজন' এর সদস্যদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ চারটি সংগঠনের সঙ্গেই একই সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। সঙ্গত কারণেই তাঁদের বক্তব্য ও কর্মকান্ডের মধ্যে বিশেষ সমন্বয় সহজেই লক্ষণীয়। ..... বিদেশী অর্থ উপার্জনের জন্য এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল বিজ্ঞাপনই হচ্ছে 'ব্যর্থ ও অকার্যকর বাংলাদেশ' এবং নিজ স্বার্থেই যে এরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যগুলোকে অস্বীকার কিংবা আড়াল করতে চাইবে এটাই প্রত্যাশিত"[৩৪]।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয়তা অনেক সময় বির্তক সৃষ্টি করেছে। তাঁদের প্রতিবাদ প্রতিরোধ রাজনীতির গতিধারা নির্ধারণে সহায়তা করছে। "কয়েকটি নারী সংগঠন, গণসাহায্য সংস্থা, মানবাধিকার বিষয়ক কয়েকটি সংগঠন এবং ধর্মীয় ধারার কিছু সংগঠন দ্বারা দেশের রাজনীতি বিরাটভাবে আন্দোলিত"[৩৫]। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট (১৯৮৪) ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি (১৯৯১) ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে 'জনতার মঞ্চ' গঠনের সাথে সংশিস্নষ্ট বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। এ সম্পর্কে একজন পর্যবেক্ষকের মন্তব্য

"বাংলাদেশের রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় বুদ্ধিজীবীদের রাজনীতি জনজীবনের এবং জাতীয় জীবনের বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের বিকাশের জন্য বুদ্ধিজীবীদের রাজনীতি বোধ হয় উপকারী না হয়ে ক্ষতিকরই হচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি তৈরীতেও বুদ্ধিজীবীদের এই রাজনীতি সহায়ক হচ্ছে না, জাতীয় অভীষ্ট আত্মনির্ভরতার স্থলে পরনির্ভরতাই বাড়ছে- রাষ্ট্র স্বাধীনতা হারাচ্ছে। এই রাজনীতির ফলে এনজিও গুলোর শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে,..... আন্তর্জাতিক অর্থতহবিল বিশ্বব্যাংকের সামনে সরকারের অসহায়তা বাড়ছে, সর্বোপরি জনজীবনের, দুর্দশাও বাড়ছে এবং ভালো সব সম্ভাবনা বিনষ্ট হচ্ছে"[৩৬]।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ:

০১। এ্যডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ,' বুদ্ধিজীবীর পরিচয়' (অনুবাদ দেবাশীষ কুমার কুন্ডু), *বুদ্ধিজীবীর দায়ভার,*(সম্পাদনা রিচি দলাই), সংবেদ, ২০০৯,পৃ.৬৯।

০২। উদ্বৃত শহিদুল ইসলাম, 'কে বুদ্ধিজীবী', *বুদ্ধিজীবীর দায়ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ.৪০।

০৩। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *চিন্তার স্বাধীনতার প্রশ্নে*, প্রফেসর জহুরুল হক স্মারক বক্তৃতা, বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদ, ২০০৮,পৃ.৭।

০৪। আহমদ ছফা (সাক্ষাৎকারে), *আহমদ ছফার সাক্ষাৎকার সমগ্র*,(সম্পাদনা নূরুল আনোয়ার) খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৯,পৃ.৬৭

০৫। শামীম আহমেদ, 'বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা', *বুদ্ধিজীবীর দায়ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৫

০৬। হুমায়ুন আজাদ, প্রবচন নং ৪০, *প্রবচনগুচ্ছ*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ.২৩

০৭। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.১০১,১০২

০৮। আহমদ ছফা, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৭

০৯। সুকুমার সিকদার, 'বাংলার সর্বনাশে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা', *বুদ্ধিজীবীর দায়ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯৯

১০। আহমদ শরীফ, 'বাংলাদেশের এখানকার বুদ্ধিজীবী সমাজ,' *বুদ্ধিজীবীর দায়ভার*, পূর্বোক্ত,পৃ.১৮৬

১১। যতীন সরকার, *আমাদের চিন্তা-চর্চার দিক্-দিগন্ত*, অনুপম প্রকাশনী, ২০০৮,পৃ.৮৫

১২। ফজলুল আলম, *বুদ্ধিজীবীর দায়ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ.২২৩

১৩। পূর্বোক্ত, পৃ.২২৪

১৪। সাফির সাফিন, *বুদ্ধিজীবীর দায়ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৫

১৫। পূর্বোক্ত,

১৬। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬।

১৭। পূর্বোক্ত, পৃ.৬৮,৬৯

১৮। আহমদ ছফা, *রচনাবলী*-২, পূর্বোক্ত, পৃ.২২০।

১৯। ফয়েজ আলম, *বুদ্ধিজীবীর দায়ভার*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২

২০। আহমদ ছফা, *আহমদ ছফার সাক্ষাৎকার সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ.৯০

২১। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *চিন্তার স্বাধীনতার প্রশ্নে*, পূর্বোক্ত, পৃ.১০।

২২। আহমদ শরীফ, *সাক্ষাৎকারে সমকাল*,(সম্পাদক আফজালুল বাসার) অনন্যা, ২০০২,পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

২৩। বেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, জ্ঞান বিতরণী, ২০০২,পৃ.৩৮০

২৪। সাঈদ-উর রহমান

২৫। মওদুদ আহমদ, *শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল*, (অনুবাদ, জগলুল আহমদ) ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২,পৃ.২৯৪।

২৬। সাঈদ-উর রহমান, পূর্বোক্ত

২৭। সাঈদ-উর রহমান, পূর্বোক্ত

২৮। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *রাষ্ট্রচিন্তায় বাংলাদেশ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৫১

২৯। রোববার, *গণ আন্দোলন ১৯৮২-৯০*, (রচনা সঙ্কলন, সম্পাদনা সৈয়দ আবুল মকসুদ), মুক্তধারা পৃ.১৫৭,১৫৮

৩০। *অবজারভার* , পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৫

৩১। *গণ আন্দোলন*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৪

৩২। আবুল কাসেম ফজলুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৩

৩৩। পূর্বোক্ত

৩৪। মাহমুদুর রহমান, 'বাংলাদেশের সুশীল সমাজের ইতিবৃত্ত', *সিভিল সোসাইটি* (ফকরুল চৌধুরী সম্পাদিত), কথা প্রকাশ,২০০৮, পৃ.১৩৭

৩৫। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৮

৩৬। পূর্বোক্ত, পৃ.৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তিচেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছিল মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। যে সাংস্কৃতিক চেতনা নিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে তা কোন সুনির্দিষ্ট, সুচিন্তিত সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে অগ্রসর না হলেও জাতীয় চেতনায় সেসময় বহু নতুন উপাদান ও অভিজ্ঞতার সমাবেশ ঘটেছিল। কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে, জাতীয় সরকার গঠিত হয়নি এবং তার মধ্য দিয়ে সে চেতনা বিকাশের প্রত্যাশিত পথও খুঁজে পায়নি। বাংলাদেশের সমাজ জীবন, গত তিরিশ বছর রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। সুস্থ-স্বাভাবিক ধারার রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ও সংকট স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতির প্রথম পর্বে প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রথম পর্বের সে ভুলের স্রোত-প্রবাহে পরবর্তী পর্বের রাজনীতির বিকাশও হয়েছে বিঘ্নিত। উন্নত চরিত্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বও গড়ে ওঠেনি। স্রোতের বিপরীতে হাল ধরার মত রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকেও করছে নানাভাবে প্রভাবিত।

বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও সাংস্কৃতিক চর্চা সমাজবিচ্ছিন্ন কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে পারে না। সমাজের নানা দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে এবং সমাজকেই আবার তা প্রভাবিত করে। এক অর্থে সমাজেই তার জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং বিকাশ। সে সমাজ যদি সুস্থ, স্বাভাবিক না হয়, তাহলে তার বিকাশও বাধাপ্রাপ্ত, বিকারগ্রস্ত হবে এটি খুবই স্বাভাবিক। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলো বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চর্চায় সত্যিকার প্রভাব ফেলতে পারেনি। রাজনৈতিক আদর্শ পরিবর্তন ও রাজনৈতিক পালাবদলের মধ্য দিয়ে সেগুলো বিকৃত হয়েছে। সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে সেগুলোর কমবেশী বিকাশ ও বিকার লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রের মূলনীতিকেন্দ্রিক মূল্যবোধগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি আজও দুর্বল নয়। তবে এগুলো নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক অনর্থক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্কে জড়িয়ে বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় অনৈক্য তৈরী করেছেন। জাতি, জাতীয়তা, জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে কেউ ঐক্যমতে উপনীত হতে সক্ষম হননি। 'বাংলাদেশী' 'বাঙালী' বিতর্কেরও মীমাংসা হয়নি। এই অমীমাংসিত জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়গুলোর প্রতিফলন সংস্কৃতিচিন্তায় ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে বিক্ষিপ্ত করে তুলেছে। জাতীয় আদর্শের প্রশ্নে একমত হতে না পারার কারণে বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ নিয়েও রয়েছে মতদ্বৈধতা। একেক জন এক এক বিষয়ে অনড় মত পোষণ করেন। ফলে বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে বহির্বিশ্বের সাথে আন্ত ঃসম্পর্ক স্থাপনে বাংলাদেশের সংস্কৃতি কীভাবে অগ্রসর হবে সে বিষয়েও দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতি চিন্তায় তাই দেখা যাচ্ছে, কেউ কেউ পাকিস্তানবাদী ইসলামী ঐতিহ্যের চেতনা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। নতুন দেশের নতুন সমাজ গঠনের জন্য, নতুন চিন্তার প্রসার তাঁরা ঘটাতে পারেননি। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, দেশ জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা সংস্কৃতি চিন্তায় বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে কিন্তু ধর্ম তাঁদের সংস্কৃতিচর্চার প্রধান অবলম্বন হওয়ায় নতুন সমাজ কাঠামো বদলাবার কাজে যুগোপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। অন্যদিকে সংস্কৃতি চিন্তায় যাঁরা এখনও অখন্ড বাংলার বাঙালি সত্ত্বায় অবগাহন করেন তাঁরা আবহমান বাংলার বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের রূপখনিকে উদ্ধার করে বাঙালি সংস্কৃতি চর্চা করতে প্রয়াসী। তাঁরা উদার, অসাম্প্রদায়িক ও সমন্বিত সংস্কৃতির বিকাশ চান। দেশজ ও লোকজ ঐতিহ্যের সমন্বয়ে হিন্দু-মুসলিমের মিলিত সাধনায় সংস্কৃতির সার্বজনীন ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তাঁরা আগ্রহী। কিন্তু রাজনীতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের মধ্য দিয়ে সামাজিক নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে নতুন সমাজ নির্মাণে যে প্রগতিশীল ধারাটি জাতীয়তাবাদের সূচনা করেছিল পাকিস্তান আমলে এবং পরিণতি পেয়েছিল বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সেই সমাজতান্ত্রিক ধারার সাংস্কৃতিক অগ্রগতি বাংলাদেশে আশানুরূপ বিকশিত হয়নি। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁদের প্রভাব কখনো বড় হয়ে ওঠেনি কিন্তু প্রগতিশীল চিন্তার মূলে তা প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছে অনেকাংশে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, ইতিহাসচেতনার অভাব ও পরমতে অসহিষ্ণুতা, বাংলাদেশের সংস্কৃতিচিন্তার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধক।

বুদ্ধিজীবীরাও নানা দলকেন্দ্রিক চিন্তা-চর্চা দ্বারা প্রভাবিত। ছকেবাঁধা চিন্তার বাইরে সৃষ্টিশীল চিন্তার প্রকাশ খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে। পশ্চাদপদ চিন্তা-চেতনা, গতানুগতিকতা ও সুবিধাবাদিতা তাঁদেরকে নানাভাবে পথভ্রান্ত করেছে। রাজনীতি ঘনিষ্ঠতা, এনজিও ও মিডিয়ামুখিতা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক ভূমিকাকে রহস্যাবৃত করে ফেলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মিডিয়াগুলো বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর ইচ্ছেমত তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে যার প্রধান লক্ষ্য বাণিজ্য। বাংলাদেশের সংস্কৃতি এসময় অতিরিক্ত মিডিয়ামুখি হবার কারণে সুস্থ-স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছেনা। তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর সংস্কৃতির অবাধ বিস্তার এবং বিবেচনাহীন ব্যবহার, শোষণের হাতকে যতটা শক্তিশালী করেছে, দারিদ্র্য নিরসনে ততটাই অপারগ হয়ে উঠেছে। দেখা যাচ্ছে গরীব দেশের জনগণকে, সস্তা বিনোদনের মধ্যে ব্যস্ত রেখে বাজার প্রসারিত করা হচ্ছে। রাজনীতিতে সক্রিয় বুদ্ধিজীবীরা রাজনীতিকে পরিবর্তনশীল করে তোলার প্রতিযোগিতায় সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলন জনসাধারণকে সত্যিকার সচেতনতা সৃষ্টির পরিবর্তে উদাসীন করে তুলেছে। সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামো তাই পরিবর্তিত হয়নি। মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকায় এবং বুদ্ধিজীবীরা বিতর্কের বিষয় নয় এমন বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করায় বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংগ্রাম সফল হতে পারেনি। শুধুমাত্র প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও ভোটাভুটির মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের চেষ্টা সাফল্যের পথে সম্ভাবনাহীন হয়ে পড়েছে।

এদেশের সমাজ সংস্কৃতির গতি নির্ধারণে বুদ্ধিজীবীরা কতটা সফল বা ব্যর্থ হয়েছেন তার দায়ভার ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে দিয়েও বলা যায় যে, এত প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়েও বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক শূণ্যতা সৃষ্টি হয়নি। গত তিরিশ বছরে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি অবহেলা করার মত নয়। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচর্যায় এখনও অনেকে একলা চলার কঠিন পথ বেছে নিয়েছেন। তাছাড়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা মানসিকতার পরিবর্তন অসম্ভব নয়। গণতন্ত্রমনা হতে হয়ত কিছুটা সময় লাগতে পারে কিন্তু নানা দ্বন্দ্ব ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরমতসহিষ্ণু বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ডের সুস্থ পরিবেশ ফিরে আসার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তির যৌক্তিক ও সুশৃঙ্খল পরিচর্যার উপরেই আগামী দিনের বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এবং এর মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা লগ্নের প্রত্যাশা পূরণ সম্ভবপর হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

০০১। অম্লান দত্ত, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৫।

০০২। অরবিন্দ পোদ্দার, *আধুনিক বুদ্ধিজীবী ও সংগ্রামী চেতনা*, গ্রন্থ বিতান, কলকাতা, ১৯৭৮।

০০৩। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *সংস্কৃতির ভাঙ্গাসেতু*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

০০৪। আতিউর রহমান, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, অন্যপ্রকাশ,মে ২০০৭।

০০৫। আতিউর রহমান, *জনগনের বাজেট অংশ গ্রহণমূলক পরিপ্রেক্ষিত*, পাঠক সমাবেশ, মে, ২০০০।

০০৬। আনিসুজ্জামান, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০।

০০৭। আফজালুল বাসার সম্পাদিত, *অধ্যাপক আহমদ শরীফ সাক্ষাৎকারে সমকাল*, অনন্যা, ২০০২।

০০৮। আফজালুল বাসার সম্পাদিত, *আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি*, অনন্যা,২০০১।

০০৯। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *সংস্কৃতির সহজ কথা*, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০২।

০১০। আবুল কাসেম ফজলুল হক,*বাংলাদেশের রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা*,কথা প্রকাশ,২০০৭।

০১১। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *রাষ্ট্রচিন্তায় বাংলাদেশ*, কথা প্রকাশ, ২০০৮।

০১২। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বুদ্ধিরমুক্তি আন্দোলন ও উত্তরকাল*, জাগৃতি, ২০০৮।

০১৩। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *আশা আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

০১৪। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *রাজনীতি ও সংস্কৃতি; সম্ভাবনার নবদিগন্ত*, এ্যাডর্ণ পাবলিকেশন

০১৫। আবুল কাসেম ফজলুল হক ও মিজান রহমান সম্পাদিত, *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা*, কথা প্রকাশ,

২০০৯।

০১৬। আবুল ফজল, *সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, মুক্তধারা, ১৯৭৪।

০১৭। আবুল ফজল,*মানবতন্ত্র*, মুক্তধারা, ১৯৭২।

০১৮। আবুল ফজল, শুভবুদ্ধি, মুক্তধারা, ১৯৭৯।

০১৯। আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার*, আহমদ পাবলিশিং হাউস,১৯৬৬।

০২০। আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০০।

০২১। আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

০২২। আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *আবুল ফজল (ব্যক্তি স্বরূপ ও সাধনা)*, মুক্তধারা,১৯৮৭।

০২৩। আলাউদ্দিন আল আজাদ সম্পাদিত, *আবুল ফজল রচনাবলী* ১, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

০২৪। আহমেদ মুসা সম্পাদিত,*বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ*, দিব্য প্রকাশ, ২০০১।

০২৫। আহমদ হোসেন ও সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, *সংস্কৃতি ও উন্নয়ন*, বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি, ১৯৯০।

০২৬। আহমদ ছফা, *বাঙালি মুসলমানের মন*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৯।

০২৭। আহমদ ছফা, *রচনাবলী (২)*, সন্দেশ, ২০০১।

০২৮। আহমদ শরীফ, *সংস্কৃতি ভাবনা*, উত্তরণ, ২০০৪।

০২৯। আহমদ শরীফ, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা*, ঢাকা, ১৯৭০।

০৩০। আহমদ শরীফ, *বিচিত চিন্তা*, ঢাকা, ১৯৬৮।

০৩১। এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ, দেবাশীষ কুমার কুন্ডু অনুদিত ও মাহবুবা নাসরীন সম্পাদিত, *রিপ্রেজেন্টেশনস অব দ্য ইন্টেলেকচুয়াল*, সংবেদ ১৯৯৭।

০৩২। এম আর আখতার মুকুল , *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮।

০৩৩। এম আর আখতার মুকুল, *কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী*, সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৭।

০৩৪। এমাজ উদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশের রাজনীতির গতি ধারা*, ঝিনুক প্রকাশ,২০০২।

০৩৫। এমাজ উদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশ গণতন্ত্রের সংকট*, হিমেল প্রিন্টার্স, ১৯৯৩।

০৩৬। এমাজ উদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতি*, জ্ঞান বিতরণী, ২০০১।

০৩৭। এমাজ উদ্দীন আহমদ, *সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতি*, নওরোজ কিতাবিস্থান, ২০০১।

০৩৮। কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, আগামী, ১৯৯৪।

০৩৯। গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, মুক্তধারা, ১৯৭৪।

০৪০। গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর প্রকাশনা, ২০০৭।

০৪১। নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত, *সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৮৪।

০৪২। নীলিমা ইব্রাহীম, *সাহিত্য সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭৪।

০৪৩। নীহাররঞ্জন রায়, *ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩।

০৪৪। প্রথমা রায় মন্ডল, *বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব*, প্রতীক বুকস, কলকাতা, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

০৪৫। ফখরুল চৌধুরী সম্পাদিত, *সিভিল সোসাইটি তত্ত্ব প্রয়োগ ও বিচার*, কথা প্রকাশ, ২০০৮।

০৪৬। ফজলুল আলম, *সংস্কৃতির নব্যরূপ রেখায় সমকাল*, এ্যাডর্ণ পাবিলকেশন, ২০০৯।

০৪৭। ফরহাদ মজহার, *নির্বাচিত প্রবন্ধ* , আগামী প্রকাশনী,২০০৮।

০৪৮। বদরুদ্দীন উমর, *সংস্কৃতির সংকট*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ১৯৬৭।

০৪৯। বদরুদ্দীন উমর, *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ (১)*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৩।

০৫০। বদরুদ্দীন উমর, *যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ*, আফসার ব্রাদার্স, ১৯৭৫।

০৫১। বদরুদ্দীন উমর, *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা*, কথা প্রকাশ,২০০৭।

০৫২। বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের ধারা*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০০০।

০৫৩। বশীর আল হেলাল, *আমাদের বিদ্বৎসমাজ*, দিব্যপ্রকাশ, ২০০৬।

০৫৪। বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, প্রকাশভবন, কলিকাতা, ১৯৭৩।

০৫৫। বুলবন ওসমান, *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব*, অরিত্র ২০০১।

০৫৬। বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *স্বদেশ ও সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৭।

০৫৭। বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *শ্রাবণে আশ্বিনে*, মুক্তধারা, ১৯৭৫।

০৫৮। বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ এবং মৌলবাদ*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩।

০৫৯। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, *রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

০৬০। ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, *আনিসুজ্জামান সংবর্ধনা-স্মারক*, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫।

০৬১। মঈদুল হাসান, *মূলধারা ৭১*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬।

০৬২। মওদুদ আহমদ, *গণতন্ত্র ও উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ*, জগলুল আলম অনুদিত, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,২০০০।

০৬৩। মওদুদ আহমদ, *শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল*, জগলুল আলম অনুদিত, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২।

০৬৪। মাহবুবুল হক সম্পাদিত, *আবুল ফজল: নির্বাচিত প্রবন্ধ*, সময় প্রকাশন, ২০০১।

০৬৫। মিজান রহমান সম্পাদিত, *বাঙালির চিন্তাধারা*, জাগৃতি প্রকাশনী, ২০০৫।

০৬৭। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত,*বাঙালির আত্মপরিচয়*,বর্ণায়ন, ২০০১।

০৬৮। মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সম্পাদিত, *সংস্কৃতি সাধক মোতাহের হোসেন চৌধুরী*, কথা প্রকাশ, ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

০৬৯। মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও জীবন রাজনীতি ২য় খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

০৭০। মোস্তাফা মোহাম্মদ, *সাহিত্যে মনন সৃজন ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৯।

০৭১। মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম সম্পাদিত, *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

০৭২। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, *মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী ২য় খণ্ড*, বাংলাএকাডেমী, ১৯৮২।

০৭৩। মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ সম্পাদিত, *আবুল কালাম শামসুদ্দীন রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

০৭৪। যতীন সরকার, *আমাদের চিন্তা চর্চার দিক-দিগন্ত*, অনুপম প্রকাশনী, ২০০৮।

০৭৫। যতীন সরকার, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮।

০৭৬। যতীন সরকার, *ভাষা সংস্কৃতি উৎসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা*, একুশে বাংলা প্রকাশন, ২০০৯।

০৭৭। রিসি দলাই সম্পাদিত, *বুদ্ধিজীবির দায়ভার*, সংবেদ, ২০০৯।

০৭৮। রুহুল আমিন সম্পাদিত, *জিয়াউর রহমান স্মারক গ্রন্থ*, হীরা বুকমার্ট, ১৯৯১।

০৭৯। রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, জ্ঞান বিতরণী, ২০০২।

০৮০। শওকত ওসমান, *সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই*, তুরহান স্মৃতিলোক, ১৯৮৫।

০৮১। শওকত ওসমান, *স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর*, বিউটি বুক হাউস, ১৯৯২।

০৮২। সরদার ফজলুল করিম, *দর্শনকোষ*, প্যাপিরাস, ২০০৬।

০৮৩। সাঈদ- উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৮৩।

০৮৪। সাঈদ-উর রহমান, *শতাব্দির সন্ধিক্ষণ*, গ্রন্থকানন, ২০০১।

০৮৫। সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২)*, অনন্যা, ২০০১।

০৮৬। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সম্পাদিত, *বাংলাদেশের প্রবন্ধ*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১।

০৮৭। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি*, আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

০৮৮। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ*, অন্য প্রকাশ, ২০০০।

০৮৯। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *রাষ্ট্রের মালিকানা*, বিদ্যা প্রকাশ, ১৯৯৭।

০৯০। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *পুঁজিবাদের দুঃশাসন*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১।

০৯১। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি*, ডানা প্রকাশনী,১৯৮৩।

০৯২। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাঙালির জাতীয়তাবাদ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ,২০০০।

০৯৩। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *গণতন্ত্রের পক্ষ-বিপক্ষ*, বিদ্যা প্রকাশ, ১৯৯১।

০৯৪। সৈয়দ আবুল মকসুদ সম্পাদিত, *গণআন্দোলন (১৯৮২-৯০)*, মুক্তধারা, ১৯৯১।

০৯৫। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, কাজল বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত , *বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি: ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার সংকট*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯।

০৯৬। সৈয়দ আলী আহসান, *আমার সাক্ষ্য*, ঝিঙ্গে ফুল, ২০০৩।

০৯৭। সৈয়দ আলী আহসান, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, সময় প্রকাশন, ২০০৫।

০৯৮। সৈয়দ আবুল মকসুদ, *বাঙালি জাতি বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ*, সূচীপত্র , ২০০৮।

০৯৯। সৈয়দ আবুল মকসুদ সম্পাদিত, *মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

১০০। সৌরিন ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত ও অনুদিত, আনতোনিও গ্রামশি, *বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা*, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১।

১০১। হাসান আজিজুল হক, *প্রবন্ধ সংগ্রহ ৪*, সাহিত্যিকা, ২০০৩।

১০২। হুমায়ুন আজাদ, *প্রবচনগুচ্ছ*, আগামী, ১৯৯৩।

১০৩। Edward said, Culture and Emperialism, Vintage, New York, U.S.A. -1994.

সাময়িক পত্র ও অন্যান্য:

১। আবদুল মতীন, সংস্কৃতির সন্ধানে, লোকায়ত, দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩।

২। আবুল কাসেম ফজলুল হক, গণতন্ত্র ও ভোটরঙ্গ, দৃষ্টিকোণ, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ এপ্রিল, ২০০৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩। সন্‌জীদা খাতুন, বাঙালির সাংস্কৃতিক মুক্তিসংগ্রাম আর সংস্কৃতি সাধনা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চতুর্বিংশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০০৬।

৪। সলিমুল্লাহ খান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সংস্কৃতি চিন্তা, সাহিত্য সাময়িকী, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ মার্চ, ২০০৮।